সতীর্থ আহসান

বিপন্ন বিস্ময়

কবিতা, অকবিতা এবং না-কবিতা সংগ্রহ

বিপন্ন বিস্ময়

কবিতা,

অকবিতা এবং না-কবিতা সংগ্রহ

সতীর্থ আহসান

উৎসর্গ-

জ্যাঠা, আব্দুল হক-কে।

যার অদ্ভুত খেয়ালে লেখার জগতে ঢুকে পড়া।

স্কুল জীবনের কতিপয় শিক্ষক/শিক্ষিকা-কে।

শুধু কবিতা লিখি বলে যাঁরা সব সময় প্রশ্রয় দিতেন।

কৈফিয়ত

গুটিকয়েক লেখা বাদে, এই বইয়ের অধিকাংশ লেখার ব্যাপারে আমার মনোভাব বিপিতা সুলভ। খর্বকায়, ফিজিক্যালি বা মেন্টালি আনফিট সন্তানের প্রতি অনেক পিতার যেমন মনোভাব থাকে। ক্লাসিক লেখকেরা তো দূর- অস্ত, এই আমার কালেরই লেখকদের ভিতর অনেকের লেখার সাথে আমার সেই লেখাগুলো তুলনা করে মনে হীনমন্যতা জাগে। ভাবি, হয়ত কিচ্ছু হয় নাই। অধিকাংশই কৈশোরিক আবেগ, ভানে- ভরা আর সরল চিন্তায় আক্রান্ত। তখন এই ভেবে সান্ত্বনা পাই, সন্তান যেমন কুৎসিত বা বুড়ো- শিশুই হোক, তার রক্তে যেমন পিতার রক্ত বয়, তেমনি, যে লেখাগুলোকে অপাংক্তেয় লাগছে, সেগুলোও তো আমারই। আমার চিন্তা, আমার জীবন- যাপন, আমার অনুভূতির ইতিহাস সেইসব লেখায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। তাদেরকে অস্বীকার করি কীভাবে?

বিপন্ন বিস্ময়

সতীর্থ আহসান

গ্রন্থস্বত্বঃ সতীর্থ আহসান

এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

প্রথম ইবুক সংস্করণঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

গাঙচিল ইবুক

প্রকাশক

গাঙচিল ইবই প্রকাশনা,
একটি অলাভজনক ইবই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান,
জামালপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদঃ সালভাদর দালির ছবি অবলম্বনে সালেহ আহমেদ

ইবুক তৈরি
সতীর্থ আহসান

মূল্যঃ ইবুকটি বিনামূল্যে বণ্টন করা যাবে।

Biponno Bismoy by Shotirtho Ahsan

GaangChil eBook
First edition Published in **September, 2019**
Created by: Shotirtho Ahsan

ভূমিকা

অধিকাংশ মহৎ শিল্পীদের জীবনীতে পড়েছি তাঁরা একটা শিল্প-সাহিত্যের পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন। তাই শিল্পী হওয়াই যেন ছিল তাদের পরিণতি। আমি এমন মহৎ কোনো পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠি নি। লেখাপড়ার প্রতি ঝোঁক ছিল এটা সত্য। এক বর্ণ অক্ষর না চিনলেও প্রায়ই বড় বোনের বই খুলে সুর করে মনে যা আসতো বলে যেতাম। সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে যেমন করে মাদ্রাসার ছাত্ররা কোরান পড়ে। কিন্তু আমার প্রথম স্কুলের স্মৃতি বেশি সুবিধাজনক নয়। পড়াশোনার বদলে মারামারিই হতো বেশি সেখানে। ছাত্রদের ভেতরে বিভিন্ন গ্যাং ছিল। তার উপর প্রায়ই মাস্টাররা আমাদের দিয়ে নিজস্ব ক্ষেতের কাজ করাতেন। স্কুলের পার্শ্ববর্তী গাছের ডালের ওপর থেকে, স্কুল বিল্ডিং এর কার্নিশের ওপর থেকে অন্যান্য ছাত্ররা এমনভাবে আমাকে ভয় দেখাতো যে স্কুল নামক ফ্যান্টাসির বারোটা বেজে যায়।

আলো আসে অন্য দিক থেকে। বাড়িতে যেমন বিকেল করে নিজস্ব ছাগলও রাখতে হতো, তেমনি মজার মজার গল্পও শোনা যেত। দাদির মুখে, বোনের মুখে, ফুফুর মুখে, আর জ্যাঠার মুখে। তাছাড়া আমার শৈশবটা কেটেছে জাদুবাস্তবতাময় জগতে। ভূত, প্রেত আর জ্বীনের গল্প সবাই এমনভাবে বলত যেন ওরা সত্য সত্য আছে। আমার পোষা ভূতও ছিল। দাদির কাছ থেকে উত্তরাধিকারী হিশেবে পেয়েছিলাম। বাল্যকালে শুনেছিলাম, আমি যেদিন হারিয়ে যাই, সেই ভূতই নাকি আমাকে বাঁচিয়েছিল। ছোট্ট আমি হারিয়ে গেলে, দাদির ভূত তার ওপর *ভর করে* জানিয়ে দেয় আমার অবস্থান; এইভাবে আমি উদ্ধার হই। ফলে, বাড়ির আশেপাশে, প্রতিটা কোণায় কল্পনার চোখে আমি তাদের দেখতে পেতাম। মনে মনে কথা বলতাম নিজস্ব ভূতদের সাথে। যেখানেই যেতাম, মাথায় তাদের বয়ে বেড়াতাম। এই ঘোর বহুদিন পর্যন্ত ছিল; সপ্তম শ্রেণিতে 'পথের পাঁচালী' আর 'অপরাজিত' পড়ার আগপর্যন্ত।

আমি কি লেখক/কবি হতে চেয়েছিলাম? লেখক বা কবি যে হওয়া যায়- এটাই তো জানতাম না। প্রথম শ্রেণিতে কী মনে যেন মুক্তিযুদ্ধের উপরে একটা কবিতা লিখি। লিখে জ্যাঠাকে দেখালাম। ঘরে ছিল জ্যাঠা, তাঁর স্ত্রী আর পুত্র-

কাছে গিয়ে বললাম, জ্যাঠা একটা কবিতা লিখছি। উনি পড়লেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। সেই থেকে শুরু। জ্যাঠার প্রশংসা পাবার লোভে তারপর একের পর এক কবিতা লিখতে থাকি। উনি পড়েন আর প্রশংসা করেন। আর বলেন, আরো লিখো আরো লিখো। যত লিখবা ততো হাত খুলে যাবে। হাত মেশিনের মতো হয়ে যাবে। হাতকে মেশিনের মতো চালু করার নিমিত্তে আমি লিখতে থাকি। তখন কবিতা বলতে তো আসলে বুঝতাম অন্তঃমিল। তাই একটা লাইন লিখে পরের লাইনের মিলের জন্যে মাথাকুটে মরতাম, প্রায়ই সহজে মিল খুঁজে পেতাম না। অনেক সময় একটা মিলের জন্যে ৩০/৪০ মিনিট মাথাকুটতে হয়েছে। ফলে, মিলের ব্যাপারটা সমাধান করতাম অন্যভাবে। বাক্যের শেষে যদি থাকত গাজি, তবে পরের লাইন লেখার আগেই ওই গাজির মিল হিশেবে মনে মনে বেশ কিছু শব্দ ভেবে রাখতাম। যেমনঃ পাজি, মাঝি, লাজি, কাজি ইত্যাদি। এবার মিলটাকে পেছনে রেখে যুৎসই বাক্য বানানোর পালা। এইভাবে লিখতে লিখতে মিল জিনিসটা মোটামুটি আয়ত্বে আসে। ক্লাস ওয়ানে শুরু, ক্লাস ফোরে শেষ। এর মাঝে কবিতা লিখি ২০/২৫ টার মতো। এরপর আবার লিখি সিক্সে। এবার গল্প সহ। প্রচুর। সব সমিল কবিতা। রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করে লেখা। সেভেনে উঠে, ১০০ টার মত কবিতা জড়ো করে একদিন পাঠিয়ে দিলাম হায়াত মামুদ স্যারের কাছে, যাতে উনি বই আকারে প্রকাশ করতে সহায়তা করেন। তিনি বললেন, এইগুলা তো সব পুরানো ধাঁচের কবিতা, নতুন ধাঁচের কবিতা লিখতে হলে বেশি বেশি পড়তে হবে। কবিতার থেকে গল্পের প্রতি বেশি টান থাকায় গল্প পড়তাম বেশি বেশি। ফলে, কবি হবার আশা বাদ দিয়ে, গল্পকার হবার ইচ্ছা প্রবল হল। হতে হবে রবীন্দ্রনাথের মতো গল্পকার। রবীন্দ্রনাথের গল্পের ভাষা কী সুন্দর কবিতার মতো! আমিও ওমন যদি লিখতে চাই, তবে কবিতাও লিখতে হবে। যাতে গদ্যভাষা শক্তিশালী হয়। এই ছিল তৎকালীন বিশ্বাস। কিন্তু সমিল কবিতা লেখা তো ঝামেলাযুক্ত কাজ। তার উপর জানতে পারলাম, এতোদিন যাকে ছন্দ বলে জেনে আসছি, তা ছন্দ না, সেটা আসলে মিল। অন্তঃমিল। কিন্তু এরই মাঝে হুমায়ুন আজাদের এক সাক্ষাৎকার পড়ে জানতে পারলাম, 'ছন্দও কবিতা না, মিলও কবিতা না- কবিতা হচ্ছে কবিতা।' যে দুটি কথা আমার কবিতা বিষয়ক দর্শনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, তাদের ভেতর ছিল হুমায়ুন আজাদের এই কথাটা আর হায়াত মামুদ স্যারের সেই কথাটা, 'এইগুলো তো পুরানো ধাঁচের...'। হুমায়ুন আজাদের ওই কথাটা পড়ার পর আমাকে পায় কে! যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত আসামিকে মুক্ত করে

কোনো ‘যা ইচ্ছা তাই কর’ দেশে ছেড়ে দিলে যে রকম উচ্ছ্বসিত হয়, আমিও ওমন হলাম। মনের সাধে লিখতে শুরু করলাম। কবিতা লেখাটা তখন এমন ঘোরে পরিণত হয়েছিল যে, স্কুল থেকে ফেরার পথে এক বন্ধুকে বললাম, আজকে অমুক কবিতাটা লিখে এমন অনুভূতি জাগছে যেন, কোনো মেয়েকে চুমু দিচ্ছি। এর ঘোরপর্ব চলল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। তারপর ’১২ সালের আগে কিছুই লিখি নাই। না কবিতা না গল্প। বইও তেমন পড়া হয় নি। শুধু সুদূর সিলেট পলিটেকনিকের সরকারি হোস্টেল থেকে কাল্পনিক বন্ধুকে কয়েকটা চিঠি লিখেছিলাম।

২.

মানুষ কেন লেখে, কেন আঁকে? কোনো কোনো মহৎ শিল্পী/সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকারে পড়েছি, না লেখে বা না এঁকে তাঁদের আর কোনো গন্তব্য ছিল না। তাঁদের বেঁচে থাকার মূল প্রেরণা ছিল সেই লেখালেখি আর আঁকাআঁকি। আমার কাছে মনে হয়েছে এই সৃষ্টি করার প্রবণতাটা একটা ঘোরের জন্ম দেয়। একবার সেই ঘোরের কবলে কেউ পড়লে, তাঁর আর নিস্তার নাই। নিজের অনুভূতির তীব্রতার কাছে এতটাই বাঁধা পড়ে যান যে, তাঁদের কাজকর্মগুলো অধিকাংশ সময়ই স্বার্থান্ধ মনে হয়। এই শিল্প-ঘোরে পড়ে পল গঁগা সুখি-সামাজিক জীবন ছেড়ে ক্যানভাসের সামনে ধ্যানস্থ হন। স্ত্রী আর সদ্য জন্ম নেওয়া সন্তানকে ত্যাগ করে রঁদার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন মারিয়া রিলকে। আমাদের জীবনানন্দ তো পুরো জীবন এই ঘোরের মধ্যেই কাটিয়ে দিলেন। এই সর্বনাশা ঘোর আমার মতো সাধারণ মানুষকেও পেয়ে বসেছিল। এই ঘোর এত তীব্র ছিল যে লেখাপড়া সব মেঘের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে খাতা কলম আর বই নিয়ে পড়ে থাকতাম দিনের আর রাতের প্রচুর সময়। বাকি সময়টুকু মাথায় বয়ে বেড়াতাম এই শিল্প চিন্তা। ফলে লেখাপড়ার বারোটা বেজে গেল। একদিন রাত একটাই অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়াই; সেও কবি হবার বাসনায়। কবি হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বিষের কৌটা পকেটে নিয়ে একদিন সারা জামালপুর ঘুরেছি। বাস্তবতার কাছে একদিন হার মেনে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরে ফেরার আগপর্যন্ত যে তীব্র ঘোরের মায়াময় জগতে বিচরণ করে এসেছি, তা আজীবনের অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

কিন্তু এই ঘোরের উৎস কী? শুধু সৃষ্টির আনন্দ? নাকি অন্যের সামনে নিজেকে বিশিষ্ট হিশেবে উপস্থাপন করারও প্রবণতা থাকে? অথবা, দীর্ঘদিন

মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার ছেলেমানুষি আকাঙ্ক্ষা? একক কোনো কারণ নেই মনে হয়। এই ঘোরের উৎস একাধিক হয়ত। আবার এও তো ঠিক, ভেতরের একান্ত অনুভূতিগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখার মধ্যে যে অপার্থিব আনন্দ আছে, সেই আনন্দে মজে থাকেন কিছু কিছু মানুষ। তাদের কাছে লিখে যাওয়াতেই আনন্দ। সেই 'কিছু কিছু মানুষ'-ই তবে প্রকৃত শিল্পী? মির্জা গালিব একবার মান্টোকে যেমনটা বলেছিলেন-

> 'কবিতা তো চেষ্টা করে লেখা যায় না; যায়, বলুন? কবিতা যার কাছে আসে, সে-ই শুধু পারে। কিন্তু কেন সে আসে, কিভাবে আসে, তা তো আমরা জানি না। আমার কী মনে হয় জানেন, হাজার হাজার দারুণ গজল লিখলেও তাকে কবি বলা যায় না, কিন্তু এমন একটা শেরও যদি সে লিখতে পারে, আর্তনাদের মতো, যাতে তার হৃদয়ের সব রক্ত লেগে আছে, তবেই তাকে কবি বলতে পারি আমরা। কবিতা তো মসজিদে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেওয়া নয়; খাদের কিনারে এসে দাঁড়ানো, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেষ কয়েকটা কথা বলা।'

মানুষ কেন শিল্পে আসক্ত হয়? এটা কি মানুষের নিয়তি যে, গান শুনে তাকে থমকে দাঁড়াতে হবে? কবিতার ঘোরে পড়ে জীবনের বাস্তব জীবনের সাফল্যগুলো তুচ্ছ মনে করে হেলায় ফিরিয়ে দিবেন একজন শিল্পী? জানি না। জীবন কী, কেন- এইসবের আদিম প্রশ্নের উত্তর এখনো উদঘাটিত হয় নি। মানুষ কখনো কি পারবে উদঘাটন করতে? নাকি, মানিক যেমনটা বলেছিলেন, 'আমরা পৃথিবীর মূল সত্য কোন দিন জানতে পারবো না তারপরেও আমরা অবিরাম মূল সত্য জানার চেষ্টা করে যাব, এটাই হচ্ছে জীবনের মূল সত্য।'? আমরা যা করতে পারি তা হচ্ছে, জীবনকে আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। জীবনের প্রতিটা মোড়ে মোড়ে যে রহস্য লুকিয়ে আছে, তা আবিষ্কার করা। খোলা চোখে জীবনকে দেখতে শেখা বোধহয় বেশি জরুরি। নোলানের ইন্টারস্টেলার মুভিতে ভালোবাসা সম্পর্কে নভোচারী এ্যামিলিয়া যেমনটা বলেছিলেন, 'ভালোবাসা জিনিষটা কিন্তু মানুষ নিজে তৈরী করেনি। বরং এটি প্রদত্ত ব্যাপার। তাই ভালোবাসাটাকে খাঁটো করে দেখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ভালোবাসা বিষয়টা অনেক শক্তিশালী। মানুষ হয়তো এখন পর্যন্ত তার অর্জিত জ্ঞান দিয়ে ব্যাপারটা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারছে না। বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভালোবাসাটাকে আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। ভালোবাসার

অবশ্যই কিছু না কিছু মানে আছে।' শিল্প কেন মানুষের মাঝে ঘোর তৈরি করে, কেন আনন্দ দেয়, কেন মানুষকে এক করে, কেন মানুষকে জগৎ মানুষ আর সময়কে অনুভব করতে শেখায়- আমরা এখনো জানি না। গভীর রাত্রে দূর থেকে ভেসে আসা বাঁশির সুর কেন আমাদের মনে দোলা দিয়ে যায়, আকুল করে তোলে- আমরা জানি না। মহাবিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা সংকেত। প্রকৃতি কথা বলতে পারে না। হয়ত, প্রকৃতি এইসব সংকেত দিয়ে আমাদের বোঝাতে চায়, আমাকে তোমরা পাঠ করো। তুমি কে, কেন? উদঘাটন করো। একজন শিল্পীই হয়ত পারেন সেই সংকেত সমূহ কুড়িয়ে প্রকৃতির দুর্বোদ্ধ ভাষাকে পাঠ সক্ষম করে তুলতে। যতটুকু সম্ভব।

৩.

আমার লেখক/কবি হবার পেছনে শুরুতে মহৎ কোনো ইচ্ছা ছিল না। বরং, মূল প্রেরণা ছিল অমর হওয়া। এই স্বপ্ন ছোটবেলায় জ্যাঠা আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সেই শৈশবে একদিন ঘরভর্তি মানুষের মধ্যে তিনি নির্দ্বিধায় ঘোষণা দিলেন, রিপন হচ্ছে সবচেয়ে জ্ঞানী। তখন থেকেই যশ-খ্যাতি, অমরতা- এইসবের ফ্যান্টাসি আমাকে ঘোরগ্রস্ত করে রেখেছিল দিনের পর দিন। তারপর একদিন রবীন্দ্রনাথের আলাপচারিতা মূলক এক বইয়ে পড়ি, উনি সঙ্গের মহিলাটিকে বলছেন, 'মরার পর আমাকে নিয়ে নাচনকোঁদন করলেই কি, বা, শেয়ালে খাওয়ালেই কি- আমি তো আর সেসবের কিছুই টের পাব না।' সেইদিন থেকে আমার ওই অমর হবার ঘোর কাটতে শুরু করে।

তবুও কেন এই বই বের করা? এই বইয়ে যে লেখাগুলো স্থান পেয়েছে, সেগুলোকে একদিন বইয়ের রূপ দেব, এমন ইচ্ছা কখনো ছিল না। বই বের করার মতো নিজেকে উপযুক্ত কখনোই মনে হয় নি। মনে হয়েছে, আমাকে আরো পড়তে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে, জীবনকে পাঠ করতে হবে আরো নিবিড়ভাবে। তারপর নাহয় বইয়ে স্থান দেওয়া যায়- এমন কিছু লেখা যাবে। কিন্তু ২৭ বছরের জীবনে দেখলাম, ওই গুছিয়ে উঠা আমার এই জীবনে আর হয়ত হয়ে উঠবে না। অথচ আমার একটা স্বাক্ষর এই পৃথিবীর বুকে রেখে যেতে চাই। খুব ছেলেমানুষি ইচ্ছা, জানি। এই মহাবিশ্বের তুলনায় যেখানে আমার অবস্থান একটা সরিষার দানা থেকেও সহস্র গুণ ক্ষুদ্র, সেখানে সামান্য লেখা দিয়ে নিজের স্বাক্ষর রেখে যাওয়ার সাধ যেন নিজেকে নিজে উপহাস করা! তবুও

রেখে যেতে চাই। হয়ত মহাবিশ্বের নিরিখে আমার গুরুত্ব পরমাণুর সমান কিন্তু আমার নিজের কাছে আমিই আমার মহাবিশ্ব। আমার কিছু অনুরাগী বন্ধু- বান্ধব আছে, তারা আমার কাছে একেকটা গ্যালাক্সি। আরো কয়েকজন অনুরাগী জুটেও যেতে পারে। আমার মহাবিশ্বে তারা হবেন নতুন গ্যালাক্সি। আমার লেখা তাদের আমোদিত করবে, এটা কম কি! তাছাড়া আমার চিন্তাগুলো, আমার অনুভূতিগুলো এই পৃথিবীতে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে, তা যত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যেই হোক- এটা ভাবতে ভালো লাগে। অনুভূতিটা এমন, যেন কোমল এক টুকরো স্বপ্ন, ছড়িয়ে পড়ছে কোষে কোষে।

গদ্যে আর ফেরা হবে না খুব সম্ভব। কবিতা দিয়ে শুরু, কবিতাতেই শেষ। আফসোস লাগে, কেন যে স্কুল জীবনে যে- কাব্য চর্চার শুরু, তা আর চালিয়ে যাই নি! যখন কবিতায় নিজের চিন্তা আর অনুভূতিগুলো প্রকাশ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, ততোদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। অনেক সময় অপচয় করা হয়ে গেছে।

৪.

বইয়ের সাবটাইটেল- *কবিতা, অকবিতা এবং না- কবিতা সংগ্রহ*। এটা নিয়েছি শাহাদুজ্জামানের কাছ থেকে। এই বইয়ে শুধু কবিতা নয়, গল্প আর চিঠিও আছে। অনেকের ভাষ্যমতে, এগুলোতেও কবিতার টোন আছে। তিনটি ভিন্ন ধরণের লেখা একটা বইয়ে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য কী? মূলত আমার সব লেখা একই চিন্তার, শুধু শৈলীটা ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া, এই লেখাগুলো দিয়ে বই প্রকাশ করার ইচ্ছা কখনোই ছিল না। যেহেতু গদ্যে আর ফিরছি না, তাই অতীতের সমস্ত কাজ একটা বইয়ে মলাটবন্দী করে রাখার ইচ্ছা হলো। এই রকম বহুবিধ কারণ।

যাইহোক, কবিতা অংশে, প্রচলিত অর্থে কবিতাগুলো কবিতা কিনা, তা জানি না। আমি সেগুলোকে কবিতা বলেই পাঠকের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। বাকিটুকু পাঠকের ইচ্ছা। তবে এমন অনেক কবিতা আছে যেগুলা আমার কাছে নিতান্তই শিশু- কবিতা লেগেছে। তবুও রেখেছি, হয়ত কোন একটা প্যারা বা উপমা অথবা রূপকল্প ভাল লেগেছে- এই কারণে। এই লেখাগুলো যদি ২০ জন মানুষকে আনন্দ দেয়, একটা বিকাল/ সকাল/ রাত অথবা সন্ধ্যা আমার

লেখাগুলো তাদের মন ভরিয়ে রাখে, আমি কৃতজ্ঞ হবো। ধূলিধূসরময় এই এক জীবনে এও অনেক।

সতীর্থ আহসান
shotirtho.ahsan@gmail.com

সূচিপত্র

[ইবুকটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ লিংক যুক্ত, পর্ব টাইটেলে মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠায় যাওয়া যাবে।]

কবিতা

- কাক ১৬
- ভবঘুরে ১৭
- পুলসিরাতে নারীটি ১৮
- মৃত্যুর স্বাদ ১৯
- সাধ ২১
- ঐশ্বরিক দড়ি ২৩
- উদ্বাস্তু ২৪
- আমার প্রতিদ্বন্দীর সকৌতুক হাসি ২৬
- একদিন তোমার জন্য ২৯
- কাফকার সাথে একজীবন ৩১
- খেয়ালি বালকের বোহেমিয়ান স্বপ্ন ৩২
- বৃক্ষ বন্দনা ৩৫
- মৃত্যু ৩৬
- ডাহুকের জন্য বিষণ্নতা ৩৮
- ছেঁড়া জুতোয় পাগলটি ৪০
- জাতিস্মর ৪১
- দণ্ড ৪২

- ক্লাশ-ক্যাপ্টেন ৪৪
- অন্য জগত ৪৬
- গল্পের গল্প ৪৮
- চতুর্মাত্রিক নিঃসঙ্গ এক রাত ৫০
- উদ্ধার ৫২
- ফেরারী ৫৩
- বাবুই পাখির বাসা ৫৫
- বিজয় দিবস বিষয়ক একটি গদ্য কবিতা ৫৭
- বিষাক্ত চুমু ৫৯
- বোধি মৃত্যুর কামনায় ৬১
- বিবর্ণ শৈশব ৬৩
- বৃক্ষ বন্দনা ৬৪
- দুধের সরের মত ঘন রাত্রি অথবা একাকিত্ব ৬৫
- শিরোনামহীন ৬৬
- বোকা বলাকা ৬৯
- আগন্তুক ৭১

অকবিতা

- অন্য জীবন ৭৪
- আদিম সীমাবদ্ধতা ৭৮
- আমি তুমি সেঃ অস্তিত্বে ‘আমিত্ব বোধ’ ৮০
- চাকরি-বাকরি, শহুরে মানুষ এবং কৈশোরিক বান্ধবি ৮৮

- কামুর নোটবুক, জীবনানন্দীয় ভূত আর উজ্জ্বল লাইটপোস্ট ৯২
- পেন্সিলে আঁকা স্কেচের স্বীকারোক্তি ৯৭
- শহুরে ইটের গায়ে লেগে থাকা তুমি ১০০

না-কবিতা

- সোলাইমানের সাপ ও গোধূলি সন্ধ্যির নৃত্য ১০৫
- সালমান রুশদী ও ভিখারি পুত্র ১১৬
- বিগ ব্রাদার ১১৯
- সাইকোপ্যাথঃ স্টোরি অফ এ সিরিয়াল কিলার ১২৫
- পোড়া পাণ্ডুলিপির আর্তনাদ ১২৯
- উদ্বাস্তু ১৩২
- প্রতিবিম্ব ১৪১

কবিতা

কাক

কাক—
ভোরের আলো গায়ে মেখে অবাক
চোখদুটি খুঁজে অচেনা কাউকে—
সারাদিনের ঠোঁকাঠুঁকি শেষে,
সেও চায় উদাস দাওয়ায় কাউকে ভালোবেসে
গাল পিঠ মাথাটা অন্তত শান্তি পাক,
কুৎসিত ঠোঁটে তবু বর্ষা নামাক।

২০১৩

ভবঘুরে

আমার টেবিলের ওপর চাদরের মতো বিছানো পেপার। সেই চাদরের ওপর বইপত্র আর খাতা- কলম ঘরবাড়ি তুলে আছে।

এক কোণায় একটা মামপট, যেন ঠিক আমার অথর্ব দাদির লাঠি।

পাশেই একটা ব্যাগ। ব্যাগে অদরকারি খুচরা কাগজপাতি, পেন্সিল, ডায়েরি আর কী কী যেন। যেন করোটিতে জমে থাকা স্মৃতি।

বইগুলো কি তবে স্বপ্ন?

হয়ত তাই হবে।

নাহলে স্তুপ করে রাখা বইগুলো থেকে বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া 'নিঃসঙ্গতার একশ বছর'- এর জন্য আজো কেন মনে গোপন দুঃখ?

বাকি যে কটা বই রয়েছে, সব তো প্রায় পোকায় খাওয়া, জীর্ণ-

জীর্ণ বইগুলোর উপরে একটা ব্যাগ। ব্যাগটা তোমাদের হৃদয়ের মতো খালি।

এখন শুধু এই শূন্য ব্যাগটি কাঁধে ফেলে কোথাও হারিয়ে যাওয়া বাকি।

২০১৯

পুলসিরাতে নারীটি

তাতানো টিনের চালে দিগ্বিদিক ছুটছে মেয়েটি।

তপ্ত কড়াইয়ের ওপর একটা ব্যাঙকে ছেড়ে দিলে যেমন লাফায়। নিচে কয়েকজন বখাটে যুবক তাই দেখে গিটারে সুর তোলে।

মেয়েটির অসহায় আর্তনাদের তালে বেজে চলে গিটার।

ওরা যখন আর্তনাদ আর সুরের তালে মাস্টারবেশনে ব্যস্ত, মেয়েটি ভাবে- বৃষ্টি নামে না কেন?

অধীরভাবে বৃষ্টির প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে এক সময় বৃষ্টির শব্দ শুনতে পায় সে। দেখে, আকাশব্যাপী রৌদ্র বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ছে তার মাথার উপর।

বখাটেদের উন্মত্ত উল্লাসধ্বণি যেন বাদলাপ্রিয় ব্যাঙের ডাক।

আহ! মুক্তি!

২০১৯

মৃত্যুর স্বাদ

তুমি জানো না, তোমার ঠোঁটে যে গোপন নদী আছে,
তাতে ঠোঁট ডুবিয়ে শুষে নিতে চেয়েছিলাম সমস্ত সুখ;
তোমার ঘন নিঃশ্বাস আমার নাকের ডগায় শতাব্দীর ভয়ংকরতম সাইক্লোন বইয়ে দিবে-
এই স্বপ্নে আমার রাত্রিগুলো বিধ্বস্ত হয়ে পড়ত!
তোমার বাদামি উষ্ণ ত্বকের সাথে আমার নীরস উত্তপ্ত ত্বক লীন হয়ে হঠাৎ বিমূঢ় সুখে
স্তব্ধতায় হারিয়ে ফেলতে চেয়েছিল তাদের অতীত আর ভবিষ্যৎ।

ঠোঁটের সাথে ঠোঁটে ঠোকাঠুকির শব্দ ভায়োলিনের সুরে বেজে ওঠতে চেয়েছিল, 'ভালবাসি'...
একবার দুইবার অজস্রবার!

শুধু চাইনি-
আমার ঠোঁটের খাঁজে খোঁজো তুমি তোমার পুরাতন প্রেমিকের উষ্ণতা;
তোমার পুরাতন প্রেমিকের গায়ের গন্ধ আমার আলিঙ্গনে খুঁজে নিও না!
তাহলে সে চুম্বন শুধু থুতু বিনিময়ে পর্যবসিত হবে।
সে আলিংগনে গনগনে চুল্লির তাপ ছড়াবে!
আমি পুড়ে যাব।

না-
ঠোঁট আছে,

সেখানে আর নদী বয় না,
শরীর আছে,
আর উত্তাপ ছড়ায় না।

এখন বুঝি শীতকাল?
ঠান্ডায় জমে বরফ হয়ে গেছে নদীর জল!

তোমার চোখে আমার শত্রুর প্রতি 'আবার ভালবাসা'...

২০১৩

সাধ

জীবনটা যেন পিঁয়াজ। খোসা ছাড়ান, স্তরের পর স্তর, শেষে দেখবেন কিছুই নাই।

-জে জি হাঙ্কার

ঘুম ভেঙে গেলে চোখ মেলে দেখি, দাঁড়িয়ে আছি টিয়ে রঙের বাড়ির সামনে।

- ভেতরে কেউ আছেন?

খুলে যায় কপাট।

তারপর একে একে অন্তর্বাসের হুকের মতো সবগুলো দরজা খুলে যায়। আর আমি হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে দেখি, কোনো নারীর বাদামি ত্বকের বদলে কেবল থই থই অন্ধকার। কোথাও নেই একটি জোনাকিও, নক্ষত্রেরাও কি সব অন্ধ?

কোনো এক পাথরের গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। আমার দুর্দশায় অট্টোহাসিতে ফেটে পড়ে পাথর। বোকা মানব সন্তান, জীবনটাকে এমন ঈগলের

চোখে কে দেখতে বলেছে তোমাকে? আমরা এই পৃথিবীর আদিম সন্তান। আমাদের কখনো সমুদ্রের তলা থেকে উঠে জলের ওপর ভেসে বেড়াতে দেখেছ? এই বলে পাথরটি ঝর্ণার জলের গায়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

আর আমি সেই গোলকধাঁধাময় অন্ধকারে হাঁটি আর ভাবি, আমরা নাকি নক্ষত্রের সন্তান, যেমনটা বলেছিলেন কার্ল স্যাগান। এও তো একপ্রকার পূর্ণতাই। লক্ষ/কোটি বছর পর আবার কি নক্ষত্রের কোলে ফিরে যাব? আবার যেন যাই। আমার গায়ের ওমে ঘুমিয়ে থাকবে পৃথিবীর কোনো এক দুর্গম অরণ্যের অচেনা বৃক্ষ।

২০১৯

ঐশ্বরিক দড়ি

ছোটবেলায় সিন্দাবাদকে বোতলে বন্দী হতে দেখেছিলাম।

এক আঙুল সমান সিন্দাবাদ- বোতলের ভেতর হাঁসফাঁস করছে; মাথার অনেক উপরে ছিপির সমান গোলাকার আকাশ।

ঐটুকু আকাশ থেকে কেউ একজন দড়ি ফেলায় আর দড়ির প্রান্তটা পৌঁছে যায় সিন্দাবাদের হাতের মুঠোয়।

অথচ, আমার মাথার উপর বিশাল আকাশ। বন্দী হয়ে আছি কড়ে আঙুলের একটা দেহের ভিতর। করছি আজন্ম হাঁসফাঁস। তবুও কেউ দড়ি ফেলায় না।

হায়, অপার রহস্যের বিশাল আকাশ!

আমৃত্যু হাঁসফাঁস করে যাওয়াই বুঝি আমার দণ্ড?

২০১৯

উদ্বাস্তু

– বাড়িত আসবা কবে?

– জানি না ত! ছুটি নাই।

– এখন তো এইখানে শীতকাল। আর ধানগাছগুলাও বড় বড় হয়ে গেছে। সকালে আর সন্ধ্যায় যখন কুয়াশা পড়ে, কী যে ভাল লাগে দেখতে! আর আমি বাইরে বাইর হতে পারি না। তখন খুব খারাপ লাগে!

শুনে খারাপ লাগে; বন্ধুটি যে ঘর থেকে বের হতে পারে না, প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যায় হাঁটতে পারে না রাস্তা বা ধানক্ষেতের ধার ধরে– সে কারণে নয়। আমার খারাপ লাগে নিজের জন্য! কী এক আবর্জনা ভরা বদ্ধ শহরে বসে আছি, অথচ ওদিকে দেশের বাড়িতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কুয়াশা পড়ছে ধানক্ষেত খোলা- মাঠ ঘন জঙ্গল কিংবা দূর রাস্তা আর পুকুরের ওপরে; তারপর সারা রাত জমতে থাকে গাছ- পালার পাতায় আর ঘাসের ডগায়, সকালে সেইসব জ্বলতে থাকে আশ্চর্য লাল আলোয়।

শহর আমাকে আটকে রাখেনি, আমিই আটকে গেছি; আবার ওদিকে গ্রাম মায়াভরা করুণ মুখে তাকিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আটকে পড়া বিদেশির মত দেশের জন্য মন বিষণ্ন হয় প্রতি রাতে। যাওয়া হয়ে ওঠে না। মনে পড়ে, নিজ জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তু সেই রোহিঙ্গাকে, যে কিনা এপাড়ে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারের কাঁটাতারের দিকে আঙ্গুল দিয়ে আকুলভাবে দেখায়, 'ঐ দেখো, ওটা আমার বাড়ি!' বিষণ্ন গলায় বলে উঠে, 'এখান থেকে বড়জোর আমার ঘর দুই এক ক্রোশ দূরে, অথচ এখন মনে হচ্ছে কয়েক হাজার ক্রোশ দূরে– ওখানে আমি হয়ত কখনোই আর পৌঁছাতে পারব না।'

এবার, বন্ধুর কথা ভাবি, ঘরের বাইরের এমন লোভনীয় শীতকন্যা শান্ত কিশোরীর মত ডাগর চোখে ডাকে হাত ইশারা দিয়ে, অথচ, ঘর থেকে দুই পা ফেলে শীতকন্যার উষ্ণ হাত ধরতে পারে না; যেন ওর মনে হয় কত ক্রোশ দূরে! আর আমি শত শত ক্রোশ দূরে থেকে শীতকন্যার দিকে যেতে পারি না। অনুভব করি, এক অর্থে, আমিও উদ্বাস্তু! বাস্তবতার জালে শহরে আটকে পড়া উদ্বাস্তু। চোখ বন্ধ করে আমার গ্রামের ছবি মনে ভাসাই আর নিজেকেই শুনিয়ে যেন বলিঃ 'ঐ দ্যাখ, তোর গ্রাম!' চোখ মেলে দেখি তা শত শত ক্রোশ দূরে!

২০১৪

আমার প্রতিদ্বন্দীর সকৌতুক হাসি

সী বীচের বুকে নরম বালিতে যেবার এঁকেছিলাম আমার পায়ের ছাপ,
পায়ের তলায় ঘন শিহরণ জেগেছিল সেবার,
যেন প্রেম প্রত্যাশি কোনো রাজহাঁস
জলের স্পর্শে সুখী হয়ে ওঠছে,
কেননা, পাশে জল বেয়ে চলা রাজহংসীর গা চুয়ে চুয়ে আসা জল তরঙ্গ তাকে ছুঁয়ে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।
তেমনি নরম বালিতে তোমার পায়ের স্পর্শের পাশে আমার পদচিহ্ন আমাকে এ দশকের সুখী মানবে পরিণত করেছিল।

আমি জানি, রৌদ্রের আগ্রাসী চুম্বন পেরিয়ে তোমাকে ছুটতে হয় শহরের রাস্তা ধরে,
মগ্ন প্রেমিকের মতো তোমার চুলে পিঠে কাঁধে ডানায়- সমস্ত শরীরে রোদ হাত বোলায়,
সুখী রৌদ্রর সুখ তোমার গায়ের গন্ধ আর স্পর্শ নিতে পেরে যখন ঠিকরে বেরোয়;
তখন আমি খুব হিংসে করি সেই রৌদ্রকে- যে তোমার কোমল ত্বকে লেপটে থেকে একা শরীরের ঘ্রাণ নেয়।

রোদ হতে পারলে খুব সুখী হতামঃ

তুমি হতে বিরান চরের একাকি বটগাছ,

তোমার শরীরের মাতোয়ারা গন্ধে ডুবে থাকতাম সমস্তটা দিন; ভালোবাসার ছোঁয়ায় রামধনুর সাতরঙে ভরিয়ে রাখতাম দিনের প্রতি ক্ষণ!

দ্যাখো, তোমার ল্যাপটপের কী- বোর্ডগুলো কী ভাগ্যবান,

তুমি জানো না, তাদের সৌভাগ্যে আমি কী রকম ঈর্ষায় জ্বলি,

চুল্লির গনগনে আগুন আমার ঈর্ষার কাছে সকালের রোদে গরম হওয়া গায়ের মতো নিস্তেজ হয়তো।

কেমন অনায়াসে তোমার হাতের স্পর্শে কত সুখী হয়ে ওঠে তারা!

তোমার ঠোঁটের লিপস্টিককে যতোটা ঈর্ষা করি, ততোটা আমি ঈশ্বরকেও করি না-

ঠোঁট ডুবিয়ে শুষে নিচ্ছে সমস্ত সুখ।

তোমার বিছানার যে বালিশে এলিয়ে থাকে আত্মগর্বী কেশ,

যে চাদর পায় তোমার দেহের ওম,

আমার মনের ক্যানভাসে তাদের গর্বিত মুখ বিষাদের তৈলচিত্র হয়ে জেগে থাকে সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত...

আমার এতো এতো প্রতিদ্বন্দীর মাঝে অসহায় হয়ে মন খারাপ করে বসে থাকি।

মন খারাপ হলেই মনের মাঝে ডুব দেই;

চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্টেশনের হলুদ ক্যানভাসে আঁকা সেই নবনীতা সেনকে...

কিংবা হলুদ বউ কথা কও গেয়ে ওঠে অপার্থিব সুরে।

অথবা,

সাদা পরীর মিষ্টি হাসি,

ঠোঁটের নাড়ানাড়া,

চোখের নাচন,

মাখন দিয়ে শিল্পীর গড়া গ্রীক ভাস্কর্যের হাতদুটি।

আজো শান্তি নষ্ট করে দেয়,
যখন আমার প্রতিদ্বন্দীগুলো দুঃস্বপ্নের রাতে মনের অন্ধকার কানাগলি দিয়ে হাতে রেখে হাত হেঁটে বেড়ায়!

ওদের চোখে ঠোঁটে ঝুলে থাকা সকৌতুকের হাসি-
আমাকে ঈর্ষায় ঈর্ষায় জ্বালিয়ে মারে!

২০১৩

একদিন তোমার জন্য

সাত দিন বেড়ানো শেষে সে যেদিন চলে যায়, আমি তার বিদায়ে বিষণ্ন হই। আর কোনদিন দেখা হবে– বাস্তবতার নিরিখে মনে হয় এমনটা হবে না বোধহয়, যেমন এই তরতাজা সাতদিনের আগে কখনো দেখা হয় নি ওর সাথে। তবুও ইচ্ছে করতে ইচ্ছে করে– দেখা হোক; আমাদের আবার দেখা হোক। ও আসুক আবার বেড়াতে। মনে মনে আরো ইচ্ছে আঁকিঃ আগামিতে কোন একদিন যেদিন আসবে ও, তখন সমস্ত সাতটা দিন ওর ছায়া গায়ে মেখে ঘুরঘুর করব পুরো সপ্তাহের প্রতিটার সারাটা দিন, এমনকি মধ্যরাত অবধি।

ও ছিল সাতদিন। কিন্তু আমার সাথে কথা হয় মাত্র একদিন, যাওয়ার আগের রাতে এবং যাওয়ার দিন দুপুরে। বাকি ছয়দিন আমার অদ্ভুত অহংকার মিশ্রিত সংকোচের কারণে কথা হয় নি। যদিও দিনে মুখোমুখি দেখা অজস্রবার। আর আড়ালে কল্পনায় ওর সাথে কথা বলতাম এর চেয়েও বেশি। প্রথম কৈশোরের সে এক ভাবাবেগময় বয়স, কাউকে দেখে চট করে ভাল লেগে গেলে শ্বাসের গতি দ্বিগুণ হবার বয়স।

ঐ স্মরণীয় রাতে, যে রাতে আমাদের কথা হয় অথবা যে রাতে ওকে নিয়ে দিবাস্বপ্নের একপক্ষীয় রোমাঞ্চকর কল্পনা থেকে বের হয়ে বাস্তব 'ওর' সাথে দ্বিপাক্ষিক কথোপকথনের মুহূর্তে প্রবেশ করি, আমাদের সুপ্রচুর কথা হয়। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে একটু একটু লজ্জা পাচ্ছিলাম, তাই

একহারা গড়নের বৈশিষ্ট্যহীন চাঁদের দিকে চোখ রেখে কথা বলি। আমাদের কথা হয় বই নিয়ে, কবিতা নিয়ে এবং তৎকালীন মুখস্ত কিছু বুলি আওড়াই। আমার কথার ভাণ্ডার খুব সীমিত, তাই ঘুরে- ফিরে একি বিষয়ে ঘুরপাক খাই। তবুও আমি বিস্মিত হই, আমার এত কথা বলার ছিল ওর কাছে? আমার ভাল লাগে, ওর এত কথা কওয়ার ছিল আমার কাছে?— এইসব জেনে।

ও আমাকে একটা ছবি এঁকে দেবে বলে আর্ট পেপার চেয়ে নেয়, দেয় নি, যাবার দিন দুপুরে বলে, আরেকবার যখন আসব তোমার জন্য একটা ছবি এঁকে নিয়ে আসব। ও আর আসে নি। প্রতিবার ভরা ফসলের দিনে পথ চেয়ে থাকতাম, পথ চেয়ে থাকতে থাকতে পথের দৃশ্যাবলি সব মুখস্ত হয়ে গেল, তারপর কোন এক বছরে ফসল ঘরে আসার সময়ে অভ্যাসবশত পথ চেয়ে বসে থাকতে গিয়ে আবিষ্কার করি, আমি কেন যে পথ চেয়ে আছি, এটাই ভুলে গেছি। কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। শুধু মনে পড়ছে পথের ধুলো, সারি সারি নারকেল গাছ।

যে রাতে ও ফিরে যায়, সে রাতে আমার বিষণ্নতাকে উদযাপন করতে খুলে বসি জীবনানন্দের কবিতাসমগ্র; মেলে ধরি 'অবসরের গান'। পাড়া- গাঁর আইবুড়োদের সাথে আমিও নাচতে নাচতে দেখতে পাই, বিয়োনো ধানের আঁটির উপর ভোরের সোনালি রোদ মাথা পেতে শুয়ে আছে। দেখতে পাই, গাছতলায় বসে মদ লয়ে অচেনা বাউল গান বাঁধছে, সেই গানের বইয়ের শেষ পাতা পড়তে পড়তে অনুভব করি, শুয়ে আছি অন্ধকার মহাগহ্বরে, একা– আর মাথা ঠেঁকে আছে হাজার বছর আগের কোন এক সম্রাটের কপাটের সাথে। বড় ভাল লাগে তখন।

তারপর, এত এত কাল কেটে গেছে, করোটিতে জমে থাকা ওর সাথেকার সেইসব স্মৃতি মলিন হয়ে ঘুমঘরে ঘুমুচ্ছে, হয়ত ঘুমন্ত এই স্মৃতির মাথাও ঠেকে আছে বহুকাল আগেই ঘুমিয়ে পড়া অন্য কোন প্রেম সম্পর্কিত স্মৃতির কপালের সাথে। এইসব নিয়ে গান লেখার অবসর কোথায়?

২০১৫

কাফকার সাথে একজীবন

ভয়ংকরভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত এ- জীবন,
আমার জীবন- যাপনের শ্লথগতি,
হাতে অল্প সময়,
আঁকতে হবে কত কত ছবি,
আমার স্বপ্নতুল্য অন্তর্লীন জগতের ছবি।

প্রতিদিন ঘুম ভাঙার পর দেখি-
কেন্নো হয়ে বিছানায় পড়ে আছি জড়োসড়ো।
আহা, একমাত্র জীবন আমার!
বড় সাধের আর বিস্বাদের জীবন।

২০১৯

খেয়ালি বালকের বোহেমিয়ান স্বপ্ন

একভাবে কেটে যাবেই জীবন। নাই বা হলো রাজপ্রাসাদের মন্ত্রী পরিষদের কোনো এক আসন অধিকৃত করা, রাজার পেছনে পেছনে ছুটে রাজার সম্মানে নিজে সম্মানিত হওয়া, অসংখ্য মানুষের হিংসার পাত্র হওয়া; মার্সিডিজ গাড়িতে চড়ে আয়েশ করে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কর্পোরেট সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার স্বপ্ন কখনোই ছিল না। ব্যয়বহুল ক্লাবের সভ্য হয়ে মাঝরাতে পতিতা সম্ভোগ কিংবা গলফে লাখ টাকার কর্পোরেট অবসর যাপনের সাধ জাগে নি কখনো। মোমের পুতুলের মত গার্লফ্রেন্ড বাগিয়ে লাখ টাকার বাইকে করে শহর ঘুরানোর ইচ্ছা কেন যে কখনো জাগেনি- এইমুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছেনা। কিংবা সুশীল বিদ্বান সমাজের হাইক্লাশ ডিগ্রীধারী মোড়লও হতে চাই না।

চেয়েছি, ভোর চলে গেলে দূর্বাঘাসের উপর যে শিশির জমে আর তাতে সূর্যের আলো এসে পড়লে যখন নতুন বউয়ের নাকফুলের মত জ্বলে, তার বুকে খালি পায়ের ছাপ এঁকে দিতে। চেয়েছি, মেঠোপথ ধরে একা একা সারাটা বিকেল হেঁটে বেড়াতে। সন্ধ্যার আড়ালে কারোর খলখলিয়ে হাসি গায়ে মেখে বিষণ্ন হয়ে পুকুরপাড়ে বসে থাকব আর দেখব অন্ধকারে জোনাকিগুলো জলের বুকে কীভাবে নেচে বেড়ায়। বিকেলের কিংবা সকালের সূর্যের আলো যখন বাঁশঝাড়ের অসংখ্য পাতার আড়ালে গিয়ে লোকায়, পাতার ফাঁক গলে ছুঁড়ে দেয়া আলোর চুমোয় ঋদ্ধ প্রেমিক হতে চাই।

পাহাড়ি পথ ধরে একা একা হেঁটে যাবো জীবনের শেষপ্রান্তে... তরী আমার পথ ভুলে ছুটুক তার আপন গতিতে। আমার নাই বা হলো পাড়ে যাওয়া!

২.

চার দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা স্থির ছায়া সেই কবে থেকেই ঘুমিয়ে আছে। একটা ভাঙা খাট, পড়ার টেবিল- যার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অপাঠ্য কিছু বই- পত্তর, টেবিলের নিচে জমাট অন্ধকার; পাশের আলমারিটার পেছনেও মুখচোরা ঘন অন্ধকার দেয়ালের গায়ে লুকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে কয়েকটা চলন্ত ছায়া সাদা চূন করা ইটের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আবার কালো মেঝেতে মুখ লোকায়। কিছুক্ষণ আগে এক হালকা গড়নের পাতলা ছায়া চার দেয়ালে বদ্ধ আলো থেকে বাইরে বেরোতে বাইরে উঁকি-ঝুকি মারলো। মাথার উপর ছাদের এক কোনায় এক টুকরো অন্ধকার সেই সন্ধ্যা থেকেই আপনমনে ঝুলে আছে। গায়ের চামড়া কাঁটা দিয়ে ওঠতেই টের পেলাম সামনের জানালাটা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

রাত বাড়তেই মানুষজন যে যার ঘরে ফিরছে। মোড় ঘুরতেই একটা বস্তার স্তুপ নজরে পড়ল। স্ট্রিট লাইটের আলোয় দূর থেকে গড়নটা ঠিকমত বোঝা যায় না, কাছে গিয়ে একটু ঝুঁকে দেখতে হয়। মানুষ। বয়স্ক মেয়ে মানুষ। ছেঁড়া কাঁথায় মোড়া মানুষ আর সাদা বস্তা মিলে এক হয়ে আছে। ব্যক্তিগত দুঃখের কাছে আর সব দুঃখ ফিকে হয়ে যায়। জীবন্ত বস্তাটির দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে না। আমার ভেতরের অন্ধকার আমার মাঝে বিষাদের হাতে হাত মিলিয়ে আমার সাথে খেলা করতে থাকে। সামনের কোলাহল, মানুষের বাড়ি ফেরার মুখরতা, দ্রুত ছুটে চলা গাড়ির শাঁ শাঁ শব্দ জানালার শার্সি ভেঙে পড়ার মত শব্দ করে ছুটে চলে... প্রত্যেকের একটা করে গন্তব্য আছে; আমি এই হলুদ আলো বিছানো পথ মাড়িয়ে যে বৃক্ষটির তলায় গিয়ে থামব- ঐটাই আমার গন্তব্য। সাথে একটা রূপসী মেয়ে থাকলে বেশ ভালো হতো। অনেক খুঁজেছি মনে মনে। পাইনি। যাদের পেয়েছি, রূপসী হওয়া সত্ত্বেও, হাত পেতে গ্রহণ করিনি। তারপর আর পাওয়া হয়নি। অজস্র রাত তার অপেক্ষায় থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। এমনি কোনো এক রাতে যখন শিশির ঝরছে টুপ টুপ করে, দূর থেকে ভেসে এসেছিল করুণ আর্তনাদঃ

'পাগল মনটারে তুই বাঁধ-

অমন করে আকাশেতে হেসেই থাকে চাঁদ।'

তাই চাঁদের নাগাল পাওয়ার আশা বাদ দিয়ে শীতরাতে শ্যামবালিকার আন্তরিক হাসির উষ্ণতার মাঝে ওম খুঁজি। জীবনে কোনো কিছুর অপেক্ষায় থেকে একটা চক্রাবদ্ধ জীবন কাটাতে সাধ জাগে না। ইঁদুর দৌড়ের জীবন ইঁদুরেরাই কাটাক। আমার আফসোসের কী দরকার। রাতের দ্বিপ্রহরে জানালার ধারে বসে থাকি থকথকে অন্ধকারের দিকে। মন গেয়ে ওঠেঃ

'এমন মানব জনম আর কি হবে?
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।'

২০১২

বৃক্ষ বন্দনা

আমি একদিন জীবনের কাছ থেকে বিদায় নেব।
আমার জীবনের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে;
এই যেমন, ১৭টার মতো বৃক্ষ রোপণ করে যাওয়া।
এই বৃক্ষের জাত হবে বিদেশি,
আর জন্মাবে দেশজ মাটিতে।
এটা মূলত স্বপ্ন-
মানে, স্বপ্নের ভার ঘাড়ের উপর থেকে মাটিয়ে ছুঁড়ে ফেলার আগপর্যন্ত মুক্তি নাই;
রোপণ শেষ হয়ে গেলেই মুক্তি!
তারপর জীবনটাকে জীবনের মার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে নির্ভার আমি চম্পট...

রবীন্দ্রনাথ আমার এই অভিপ্রায় শুনে স্বর্গে বসে কী বলবেন, জানি...
বলবেন, বোকা! তুমি বৃক্ষ বন্দনায় জীবনটা নষ্ট করে দিলে?
মৃত্যুর পর সেই বৃক্ষের ডাল ধরে কে ঝুলে থাকল,
অথবা কে ফল খেয়ে গুণগাণ গাইল, তাতে তোমার কী?

জানি।
তবুও মানুষ স্বপ্নের পুকুরে একবার ডুবে গেলে
ক্রমাগত জলকে বাতাস ভেবে তা নিঃশ্বাসে গ্রহণ করাই তার নিয়তি।
তারপর, হয় মৃত্যুর আগপর্যন্ত জল খাও
নয়ত সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছাও...

২০১৫

মৃত্যু

যে বালকটির মাথায় পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান, অসংখ্য মানুষের ভীড়ে তাকে দেখা গেলো মাঠের এক কোণায় পেট চাপড়ে বসে আছে; দীর্ঘদিন যাবৎ ওর পেটের পীড়া। পেছনেই বালুর মাঠ, সে মাঠের মাঝখানে ফায়ারিং স্কোয়াড, একটু তফাতে ঘণ্টি হাতে দাঁড়িয়ে এক দফতরি। একটু পরেই সেই আকাঙ্ক্ষিত ঘণ্টার শব্দ কানে এসে ধাক্কা লাগে ওর, আর এত পীড়া সত্ত্বেও আনন্দে লাফিয়ে ওঠে বালকটি, এক ছুটে চলে যায় লাইব্রেরির ভেতরে।

গিয়ে দেখে, ওর গুরু আর সতীর্থরা চুপচাপ বসে আছে। সে ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে ওরা তার দিকে ফিরে তাকায়। কিন্তু সেদিকে বালকের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। বরং চোখে-মুখে ফুটে ওঠেছে কৌতুক মেশানো অবজ্ঞার হাসি। বালকটি সোজা চলে যায় একেবারে পেছনে, সেখানে ওর পুঁথি আঁকড়ে বসে আছে ওর সবচেয়ে যে ঘনিষ্ঠ সতীর্থ; গিয়ে বলে, 'বেল পড়েছে শোনো নি? মরতে যাবে না?'

গুরু আর অপর সতীর্থরা কৌতূহলী চোখে তাকায় বালকটির দিকে। ঘনিষ্ঠ সতীর্থটির এখন মরতে ইচ্ছা নেই। সে আরো কিছুদিন বাঁচতে চায়। তাকে একাই মরতে বলে দাঁতে নোখ খুটতে থাকে সে আনমনে, সামনের দিকে তাকিয়ে। ফলে, বালকটি ক্ষুণ্নমনে একাই সামনে আগায়।

একজন গুরু চাপা রাগি গলায় জানতে চান, 'তুমিই ছিলে আমাদের অনুপ্রেরণা, আর সেই অনুপ্রেরণাতেই আমরা এই জ্ঞানসভার আয়োজন করেছি, অথচ তুমিই এখন চলে যাচ্ছ যে?' বালকটি এই কথায় আর তার দিকে নিক্ষেপিত সবার কৌতূহলী দৃষ্টিতে বিপন্ন বোধ করে। মরিয়া হয়ে উত্তর দেয়, 'কিন্তু আমাকে যে মরতেই হবে!'

- মরে গিয়ে কী লাভ?

- *বেঁচে থেকে যে লাভ!*
- *পৃথিবীর রূপ রস পান করা থেকে বঞ্চিত হবে তুমি!*
- *সেই সাথে বোধ নামক যন্ত্রণা থেকেও মুক্তি পাব, গুরু!*

ভূয়োদর্শী বালক তারপর মুক্তির আনন্দে নির্ভার পায়ে হাঁটতে থাকে, মনে মনে গুনগুনিয়ে। দিনটি নারীর সাদা উদ্ভিন্ন স্তনের মত কোমল লাগছে এখন, আর ফায়ানিং স্কোয়াড যেন সদ্য বিবাহিত নারীর যোনি; পেটে প্রচণ্ড পীড়া সত্ত্বেও কী এক দুর্নিবার আকর্ষণে বালকটি সেদিকে কাঁপা কাঁপা পায়ে আগায়। একটু পরেই ওর চোখে পড়ে মাঠের মাঝখানে নারীর ঊরুর মত দাঁড়িয়ে থাকা দুটি থাম। স্তনের কোমলতা গায়ে মেখে সে এবার সেই যোনিতে অবগাহন করতে যাচ্ছে। এরপর কী ঘটবে সে জানে। সে জানে, এরপর ১০ মাস সেই জমাট অন্ধকারাচ্ছন্ন জরায়ুতে ঘুমিয়ে কাটাবে; তারপর ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পুনরায় কোন অস্তিত্বশীল প্রাণী বলে অনুভব করার বদলে ডিম্বাণু আর শুক্রাণুতে বিভক্ত হয়ে যার যার উৎসে ফিরে যাবে...

আহ! শান্তি! শান্তি!

২০১৬

ডাহুকের জন্য বিষণ্নতা

‘কেউ ধরো না আমায়! ধরো! পড়ে গেলাম তো। দাদি কই গেছে? যাহ! পড়েই যাচ্ছি–’

চৌকি থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ছি। কিন্তু, ধীরে– এত ধীরে! চৌকি আর মেঝের মধ্যকার দূরত্ব এই বড়জোর দুই মিটার! কিন্তু পড়ছি অন্তত সেই দশ সেকেন্ড ধরে। ইচ্ছা করছে অনন্ত কাল ধরে যেন এই ভাবে মেঝের দিকে পড়তেই থাকি। শূন্যের মাঝে বসত বাড়ি। কিন্তু পড়তে পড়তে এবার পৌঁছে গেছি মেঝেতে। আলতো করে মাটি স্পর্শ করে শরীর। আহ–!

দরজার কাছে পৌঁছে যাই। পরে মনে করতে চেষ্টা করেছিলাম, কীভাবে ওখানে গিয়েছিলাম; কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারিনি। শুধু মনে পড়েছিল, উঠোন থেকে কে যেন ডাকছিল সেই কখন থেকে! দরজা খুলে আমি মুখ গলাই, হাত দিয়ে তারা ইশারা করে উঠোনে নামতে। দরজার হাতল ছেড়ে উঠোনে নামতে আমার ভাল লাগে। ভয় করে না একটুও; বরং খুশি হয়ে ওদের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াই। খুব আপন লাগে এদের, অথচ তখন একটুও চিনতে পারি নি তাদের একটাকেও।

আমার খুব ভাল লাগে। বাড়ি থেকে একা কোথাও বের হবার সাহস নেই, অথচ একাই চলে এসেছি এত দূর! জায়গাটা চিনতে পারিঃ আমার নানির বাড়ির মোড়! কে যেন পেছন থেকে বলে ওঠেঃ মামা, তুমি এইখানে? কণ্ঠস্বরটা আবার কোথায় হারিয়ে যায়। আমিও তাহলে একা বের হতে পারি! খুশিতে হাত দুটো শূন্যে মেলে দেই; মাটির থেকে পা আলগা হয়ে শূন্যে ভাসতে থাকে। আমি উড়ছি! উড়ছি! দ্যাখো– দাদি, দ্যাখো আমি উড়ছি! ও মা–

মাথার ওপর ডাহুক ডাকে। গতকাল এই ডাহুক খাঁচার ভেতর থেকে পালিয়ে গেছিল, আমি ঠিকঠিক চিনতে পারছি! অনেক মন খারাপ ছিল ডাহুকটা হারিয়ে যাবার পর। আমার মনে হয় কে যেন ছেড়ে দিয়েছিল। নাহলে পালানোর কথা তো নয়! ও…! আমি তাহলে এই ডাহুক ধরতেই এখানে এসেছি? কিন্তু

কই গেলো উড়ে উড়ে। এই গাছটার ডালেই না বসে ছিল! হয়ত বাড়ি চলে গেছে।

সামনে একটা দোকান, তা আবার ঘেরা আছে হলদে কারেন্টের বাতির আলোয়। এত রাত, অথচ এখনো খোলা। পাশে কয়েকজন ভবঘুরে কেরাম খেলছে। কাছে যাই। কিসের ভবঘুরে! এরা তো দেখছি সেই ছেলেরা! এরাই তো আমাকে ঘর থেকে বাহির করেছে। অন্ধকার ছেড়ে ওদের দিকে হাঁটা দেই। আবছা আলোয় ওদের ওদের এখন অনেক বড় বড় লাগছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াই। বলি, 'আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও।' তবু খেলতেই থাকে। আবার বলি। 'এইযে শুনছ, আমি বাড়ি যাব।' এবার, ঘুরে তাকায়। শূন্য চোখে ও তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। কোনো কথা বলে না। অপরপাশের একজন ধমকে ওঠেঃ 'কে তুমি?' আমি চোখ তুলে তাকাই। কাঁধে দেখি সেই ডাহুক পাখি।

এখন আমি কার সাথে বাড়ি যাব! একা একা হারিয়ে যাব যে! ডাহুক চাই না আমি। আমি দাদির কাছে যাব। যদি হারিয়ে যাই? 'কেউ আছেন?' চিৎকার করে ডাকতে চাই। কিন্তু কথাগুলা মুখ থেকে জোরে জোরে বেরোবার সাহস পায় না। ভয় পাওয়া পায়ে, পা টিপে টিপে সামনে এগোই। অন্ধকার সামান্য পাতলা হয়ে আসছে। দানা দানা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে বাড়ি ফেরার পথ হাতড়ে বেড়াই।

২০১৪

ছেঁড়া জুতোয় পাগলটি

পিচ রাস্তা গাড়ির ঘর্ষণে কঁকিয়ে ওঠে মাঝরাতে;
স্ট্রিটলাইটগুলো বখাটে যুবকের মতোন সারা রাত কেবল অট্টহাস্য করে,
বেদনার্ত রাস্তা নালিশ জানায় দুইপাশের প্রতিবেশি মেট্রোপলিটন
বাড়িগুলোকে;
সাড়া মেলে না।

কেবল এক পাগল ভবঘুরে কান পেতে শুনে।
মাঝরাতে ছেঁড়া জুতোর ঘর্ষণে যে মাতিয়ে রাখে পাড়া।
একা একা কথা বলে যায় নিঃসঙ্গ সড়কের সাথে।
এলোমেলো, খাপছাড়া।

২০১৯

জাতিস্মর

আমাদের এই লোকালয়ে আমি অনেকদিন পর ফিরে আসলাম। আমার মৃত্যুর পর বহু বছর কেটে গেছে। বহু বছর পর ফিরে এসে প্রথম যে দৃশ্যটি দেখে চমকে ওঠলাম, সেটা হচ্ছে, আমার ঘর। চারদিকে চারটি দেয়াল আর মাথার উপরে চালা যে শূণ্যতাটুকু বন্দী করে নাম নিয়েছিল ঘর- আমি সেই শূন্যতাটুকুতে স্বাধীনতা উপভোগ করতাম যেমন একান্ত বৌয়ের যোনি আর স্তনে আমার অধিকার থাকে।

আবার ফিরে এসে দেখি, ওটা আর কারোর একান্ত মুহূর্ত কাটানোর জায়গা নেই; পরিণত হয়ে গেছে রঙ্গশালায়। প্রতিদিন বিভিন্ন নাট্যকারের লিখিত ঘটনাবলী অভিনয় করে যাচ্ছে বিভিন্ন শিল্পীগণ। আমার একান্ত শূন্যতাটুকুর ভিতরে।

আমি খোদার কাছে দুহাত তুলে ফরিয়াদ জানালাম,

- হে খোদা, জন্ম যখন একটা দিয়েছিলে, তবে কেন স্মৃতির যন্ত্রণা দিলে?

এর চেয়ে হতাম যদি আমার বাড়ির সামনেকার দেবদারু গাছ, যার যাপিত জীবন চারপাশে মূদ্রিত হতো ঠিকই, অথচ, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে, দেয়ালে লটাকানো ঘড়িটার মতো হৃষ্টচিত্তে জবাব দিতোঃ

'আমার জীবন- যাপনের কোনো অভিজ্ঞতা নাই।'

২০১৯

দণ্ড

অদৃশ্য হয়ে যাবার স্বপ্ন আমার আশৈশব
কেউ দেখবে না আমাকে, অথচ আমি দেখব সবাইকে-
তারপর একদিন ভুলেই যাবে সবাই।
তখন আমিও ভুলে যাবার অন্তত একটা সুযোগ পাব।
কী বিচ্ছিরি যে জীবনের সেই মায়া...

তখন কেউ আর আঙ্গুল তুলবে না আমার দিকে,
মুখ বাঁকাবে না,
তাদের চোখে দেখতে হবে না জলন্ত ঘৃণা!
সবাই ব্যস্ত থাকবে 'তারা' শুধুই 'তাদের' নিয়ে।

প্রথমবার এই স্বপ্ন দেখিয়েছিল আরব্য রজনীর কাম জাগানিয়া শাহজাদির হাতের ইশারা;
আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমার পার্থিব কাঁথা-বালিশের কথা;
বরং উড়ছিলাম তার স্বপ্নালু হাতছানিতে নিবিড় নীলিমায়,
উড়ে উড়ে যখন তারাদের দেশে গিয়ে পারস্য রাজকন্যার হাতে চুমু খাব-এই স্বপ্নে বিভোর,
তখন পৃথিবীর সমস্ত ভোর একযোগে চিৎকার করে ওঠল।
আমাকে নীলিমার হাতে ছেড়ে দিতে চায় না একটা ধূলিকণাও!
পার্থিব ভোরের কাছে পরাজিত হল আমার স্বাপ্নিক রাত্রি!

আমার আর অদৃশ্য হওয়া হল না।

এর জোয়াল আজো বয়ে চলেছি;
ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত।
জীবন কাঁধে চড়ে বসেছে আয়েসে;
আমি গয়লার ষাঁড়ের মত অন্ধকারে জোয়াল কাঁধে কাকে যেন কেন্দ্র করে ঘুরছি তো ঘুরেই চলছি...

২০১৩

ক্লাস-ক্যাপ্টেন

নেতা হতে চাই নি, তবুও ক্লাশে কেমন করে যেন একবার নেতা বনে গেলাম।
চুপচাপ বসে থাকি,
কাউকে ঘাঁটাই না,
সবার সাথেই পাশের বাড়ির ভাবির সাথে যেমন, তেমন সুন্দর ব্যবহার,
আমি যে ক্লাশের একজন ছাত্র- এই গভীর গোপন কথা যেন বেশি চাউর না হয়ে যায় পাছে,
এই চেষ্টার অন্ত নেই আমার মনে মনে!
বেঞ্চের এক কোণায় পড়ে পড়ে সাঁতার কাটি নিজস্ব পুকুরে।
তবুও বড় ভাল লাগে আর সকলের ভালবাসা;
এত ভালবাসা আর মান্যতায় গলে যাই একেবারে…
বড্ড বিব্রত বোধ করি!

একদিন ভালবেসে তারা আমায় নেতা বানাল;
পুরো ক্লাশের ক্ষমতা তখন আমার হাতের মুঠোয়;
বেঞ্চের কোণা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।
সমস্ত ক্লাশের চলন্ত দৃশ্যটাকে দুচোখে পুরে মুহূর্তেই স্থির করে ফেললাম সমস্ত চলন্ত অবয়ব।
এখন আর তারা আমার বন্ধু, ক্লাশমেইট, মানুষ কিংবা শব্দরাজি নয়;
আমার চোখের মণিতে বাঁধানো একেকটা স্থির চিত্র মাত্র!

আমি এখন নেতা,
অথচ দ্যাখো, কুত্তার বাচ্চাদের কী সাহস-

পিঠ ঘুরিয়ে, মুখ বেঁকিয়ে, হাত ছুঁড়ে, চোখ ঠাঁরিয়ে- গল্প করছে আপন মনে!
চোখের ভেতর যে স্থির চিত্রটি ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, সীতার চিতায় নিক্ষেপ করলাম প্রচন্ড গর্জন করে-
'সবাই মাথা বেঞ্চের ওপর রেখে পা আক্কাশ মুখি করে দাঁড়া, স্যার আসার আগপর্যন্ত এই তোদের শাস্তি!'

আমার শব্দের তীব্রতা আমাকে বড্ড ভরসা দেয়।

২০১২

অন্য জগত

মাঝে মাঝে এমন হয়; রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় নিজের ছায়ার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে তাকি। এই যে আমার সাথে সাথে হাঁটছে যেন সে আমার ছায়া নয়, অন্য কারোর; তাকে আমি ঠিক-ঠাক চিনি না। যেমন, অনেক ছেলেবেলায় আয়নায় অবাক হয়ে তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা করতাম নিজেকে, এটাও যেন তেমন। সেই চলার পথে আমার চারপাশে পথের ওপর বিছানো আলো মাড়িয়ে চলছি, আর মানুষজন ছুটে চলছে, কোথায় গিয়ে তারা অবশেষে থামবে, কে জানে, আমি তাদের মাঝে পথ করে চলছি, তখন এটাই একমাত্র বাস্তবতা মনে হয়; বাকি সব যেন টিভির স্ক্রিনে দেখা সিনেমা! গাড়ির হট্টোগোল, ধোঁয়া, আর মানুষের ভিড় ঠেলে আমার পার্থিব শরীর যখন বাড়ির দিকে ফিরছে, হয়ত সে সময় আমি ভাবছি কিশোরী আনা ফ্রাংকের কথা। ভাবি, একদিন সবাই তো মরে যায়, তবে কেন তাকে মারার জন্য এত হাঙ্গামা? কী লাভ হয় মেরে? কী এমন ক্ষতি হতো তাকে বাঁচিয়ে রাখলে? আর ওমনি চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছোট্ট আনার মুখ; ঝুম বৃষ্টি, সোডিয়াম আলোতে ভিজে রাস্তা নাচছে, সে নৃত্যরত রাস্তার বুকের ওপর দিয়ে ছুটে চলছে পথ না জানা দুটি ছোট্ট পা। ভিড় ছেড়ে যখন আমি বাড়িমুখো নির্জন রাস্তায় পা বাড়ায়, আর আমার ছায়াটাকে খেয়াল করি, তখনই তাকে কেমন যেন অচেনা ঠেকে! বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাবার হাত ধরে ছুটে চলা ছোট্ট আনা হয়ত জানে না তার গন্তব্য কোথায়, তাকে নিয়ে কোথায় লুকাতে যাচ্ছে তার বাবা, কিন্তু আমার তখন আনার কথা ভাবতে ভাবতে সেই ছায়া হয়ে পথের সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। পৃথিবীর কাছে, চারপাশের কাছে, বাবা মা'র কাছে, এবং সর্বোপরি নিজের কাছেই অচেনা

আগন্তুক হয়ে যেতে সাধ জাগে। ঠিক ঠিক অনুভব করি, আমি আসলে এই পৃথিবীর কেউ না। আর, তা হতেও চাই না।

২০১৫

গল্পের গল্প

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে, কেবল তখনই মনে পড়ে আমি এক অনাত্মীয় দ্বীপে আছি।
যে ছোট্ট চিলেকোঠায় শুয়ে, তার দেয়াল তাদের নিজস্ব গল্প বলে যায়;
এই শহরের আলো বায়ুর প্রতিটা ফোটন- কণায় যে গল্পেরা প্রতিনিয়ত খাবি খেয়ে খেয়ে বেড়ে ওঠে,
তাদের গল্প শোনার সময় কই?

বরং দেয়ালের গায়ে যে গল্পেরা ওঁত পেতে আছে, তাদের গল্প শোনা যাকঃ
এক সকালে তোমার মত উদভ্রান্ত এক যুবক এসে হাত পাতে;
'আমার গল্পগুলো ফিরিয়ে দাও,
এ আমার নাগরিক অধিকার।'

বস্তুত তার গল্প এতোই মর্মন্তুদ,
আমি সবুজ বয়ামে রেখে বিস্মৃতির জাদুঘরে পাঠিয়ে দেবার কথা ভেবে রেখেছিলাম।
এখন কে আর এই শহরে নস্টালজিক হয়, বল?
আমি তার গল্প এই পরিচ্ছন্ন আর হলুদ পাথরে গড়া নির্জীব শহরে মুক্তি দিয়ে শহরের প্র্যাস্টিজ নষ্ট করতে পারি না।

কেননা, তার গল্পে ভরা ছিল শুধু—
সোঁদা মাটি
নদীর তীর
ধানক্ষেত

কেঁচোর গড়াগড়ি
গ্রাম্য বালিকার আঠাল চুমো
প্রাগৈতিহাসিক আলো আর বায়ুর ছড়াছড়ি!

২০১৪

চতুর্মাত্রিক নিঃসঙ্গ এক রাত

রাত্রের ঢাকা শহর নাকি বেশ্যা হয়ে ওঠে,

নিয়ন আলোর ফ্যাকাশে উত্তাপের নিচে সবার কাঁপা কাঁপা ছায়া হাইরাইজ বিল্ডিং আর ফুটপাতের গায়ে অন্ধের মত পথ চলে;

কারোর চোখে-মুখে নেই ভালোবাসা কিংবা স্থিরতার চিহ্ন,

যেন এইমাত্র বুড়ি এক বেশ্যার সাথে কন্ডম ছাড়াই সঙ্গম করে ফিরছে;

সবার চোখে মুখে অজানা এক উদ্বেগের হলুদ রেখা ফুটে ওঠে।

কমলা রঙের ঝাপসা আলোর নিচ দিয়ে শাঁ শাঁ করে ছুটে চলা গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে অথবা মাঝ দিয়ে ক্ষিপ্র অথবা টলমলে পায়ে হেঁটে চলা এক বেশ্যাভোগী হাওয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছিল তার শীত্কারধ্বণিঃ

'বস্তুত, শহর বলতে বুঝি আমি মানুষ আর তার কালচার; ঢাকাবাসীকে নিউ ইয়র্কে ছেড়ে দিলেও তারা তাকে ঢাকা বানিয়ে ছাড়বে!'

একদা তারাও যে কুয়াশার ঘ্রাণে ভরা বাতাস গায়ে মেখে শিশিরভেজা গাঁয়ের পথে হেঁটে হেঁটে বহুদূর হারিয়ে যেত;

চোখে খেলা করত ডাংগুলি খেলার স্নিগ্ধতা,

ভোরের ধোঁয়া ওঠা পুকুরে হাঁসদের প্রতিদ্বন্দী করে পাশাপাশি সাঁতার কাটার কোমল উত্তেজনা;

কংক্রিটের শক্ত দেয়ালের নির্লিপ্ততায়, রোগাক্রান্ত যানের ধোঁয়ার অন্ধকারে, ঝানজটের বদ্ধতায়- তারা একদিন এইসব ভুলে যায়- সব।

ভুলে যায়, ভালোবাসায় কোনো প্রতিদান প্রত্যাশা করতে নেই।

২.

ছেলেটি সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে একটা সম্পর্ক খুঁজে বেড়াচ্ছিল,

এক চিলতে ভেপসা অন্ধকার কুঠুরিতে আনমনে একটানা সিগারেট ফুঁকছিল আর

কোন এক অজানা অচেনার পদধ্বণির প্রতীক্ষায় বাইরে তাকিয়ে ছিল।

কারোর গায়ের সোঁদা গন্ধ গায়ে মেখে এই একাকিত্বে ডোবা শহরে হেঁটে বেড়াবে, পাশাপাশি;

আর চকিতে জেনে নেবে তার একান্ত ইতিহাস!

বুড়ি বেশ্যার গায়ে রাত্রির নীরবতায় দুটি ঘনিষ্ঠ ছায়া হেঁটে বেড়াবে রাতের মাতালদের মত।

দরজার ভাঙা ফুটো গলে আসা সকালের মৃদু আলোয় সিগারেটের ধোঁয়া ক্রমাগত কুন্ডুলি পাঁকায়।

নারী নয়- ভাবনায় মা হারা চড়ুইপাখি উড়তে থাকে, উড়তে উড়তে থাকে।

৩.

পূর্ণিমার স্তব্ধ রাতে শাঁই শাঁই করে উড়ে যায় পানকৌড়ির দল,

নিচে ঘুমন্ত পৃথিবীতে কোন এক পিচঢালা অখ্যাত রাস্তায় নিথর পড়ে থাকে বোকা রাজহংসী।

সংগীকে খুঁজতে বেরিয়েছিল-

সেই বিকাল থেকে লাপাত্তা;

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঁয়ে মেখে যখন রাস্তায় লম্বা গলা বাড়িয়ে দিল

এক মাতাল বাস পিসিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল পলকে-

গায়ের সমস্ত শক্তি ঢেলে টেনে তুলতে চায় পিচের গায়ে পিসে যাওয়া লম্বা গলাটি।

ওর তো ওভাবে ওখানে লেপ্টে থাকার কথা নয়;

জোছনার প্রান্তরে হারিয়ে যাওয়া সংগীকে খুঁজে ফেরার কথা!

অবশেষে রাত বাড়তে থাকে এই নিয়ন আলোর শহরজুড়ে...

পেছনে পড়ে রয় রাজহংসীর নিথর দেহ।

১১ নভেম্বর, ২০১২

উদ্ধার

কামুক দৃষ্টি হেনে এক রূপসী প্রৌঢ়া তখন বারান্দায়-
বুক দুটি তোয়ালে পেঁচানো, যেন সদ্য স্নান করে ফিরেছে;
কাছে গিয়ে দাঁড়াই তার দৃষ্টির ইশারায়।

কাছে গিয়ে ছুঁয়ে দেই;
আর সাথে সাথে দেখতে পারি,
দেখতে পাই-
চোখ দিয়ে রক্তের ফোয়ারা বইছে,
মুখে যেন শত বৎসরের ঘা আর দুর্গন্ধ!
মৃত স্তন ঘুমন্ত, অনড়।

যোনি?
নাহ! একদিন যা ছিল জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি, সেদিকে নজর দেবার আর সাহস পাই না।
কে জানে কত শত পম্পেই নগরী ধ্বংস করে আজ শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে।

অথচ ওমনি চোখে ভেসে ওঠে তোমার ছবি। আমি পেয়ে যাই সমাধান। যতটা ভালভাবে পারি, জ্বলন্ত লাভায় বন্দী হয়ে ফসিল হয়ে যাওয়া সেই নগরীর স্মৃতি- অনুভূতি- মুহূর্ত আর ভাবনাগুলো উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে তাই তোমার দিকে রওনা দেই...

২০১৬

ফেরারী

আমাদের একটা বাড়ি ছিলো—
না না, ভুল বললাম; সরি!
বাড়ি না তো– ঘর।
বাড়ি হলে তো চৌকাণা উঠোন থাকতো,
থাকার ঘর আর রান্না ঘর- দুই নর- নারীর মতো মুগ্ধ চোখে একজনের দিকে আরেকজন তাকিয়ে থাকতো, তাই না?
যখন দুই ঘর শীতের রাতে বালক- বালিকার প্রথম প্রেমের অভিসারের মতো কুয়াশার আড়ালে নীরব খুনসুটিতে মত্ত,
তাদের পায়ের কাছে স্কুল ব্যাগ হয়ে পড়ে থাকত পাকা করা টিউবওয়েলটা।

এক পড়শি বড়ো আপা, আমাকে এমন শক্ত করে জাপটে ঘুমিয়ে থাকত যে, শ্বাস নিতে কষ্ট হত;
শ্বাস কম নিয়েও যে গায়ের ওম আর নারীর শরীরের ওমের দিব্বি সুখে রাতটাকে পার করে দেওয়া যায়, তা ছোটোবেলাতেই বুঝে গিয়েছিলাম।
বললাম তো— আমাদের কোনো বাড়ি ছিলো না;
বাড়ি হলে ওই পড়শি আপার মতো গাছ- গাছালিরা ঘর- উঠোন- টিবওয়েল জাপটে ধরে ঘুমিয়ে থাকত!

আমাদের একটা ঘর ছিল।
ঘরে কয়েকজন 'দ্য মোস্ট ফেমিলিয়ার স্ট্যাঞ্জার' ছিল।
বাইরে অপরিচিত সব মানুষের খালি হৈ- চৈ হট্টোগোল!
আমাদের সবার ছায়া দেয়ালের গায়ে প্রায়- ই ক্যালেন্ডারের মতো আটকে থাকত,
কদাচিৎ নড়াচড়া করলে, মনে হতো– যেন ছায়ারা কাঁপছে!

এইসব ঘরেতে গম্ভীর ছায়ার মাঝে আমিও একদিন কবে যেন ছায়া হয়ে গেছি।
আমার আর বাড়ি ফেরা হয় না—
না স্বপ্নে, না জাগরণে!

২০১৩

বাবুই পাখির বাসা

সে- রাতে, অনেক রাতে, বিছানায় ফিরল ছেলেটি।

শহরের ভেতরে কিছু কাজ ছিল তার;

কাজ না ঠিক, অকাজ!

এলোমেলো পায়ে শহরের অলিগলিতে হেঁটে বেড়ানো, চোখ-কান বিঁধিয়ে দৃশ্য আর শব্দ নখরে তুলে নেওয়া-

আর ঘরে এসে সেসব দৃশ্যাবলী এবং শব্দরাজি একে একে খসানো!

মজায় তো লাগে তার।

কিন্তু আরো মজা পেল সে রাত্রে চিরকুট পড়ে।

ঘরে ফিরে দেখে টেবিলের ওপর ছাই রঙের পেনসিলের নিচে চিরকুট টা লজ্জায় লাল হয়ে আছে!

'আপনার কমলা রঙের সুয়েটারটা তো বেশ ভালোই ছিল; আমার খুব ভাল লাগত সুয়েটারের সামনেকার ছবিটা; ধুসর দুই দেয়ালের রেলিঙে দুটি পাখি, ওপরে নীল আকাশ, নিচে- ছড়ানো ছিটানো ফ্যাকাশে ঘাস! আপনি যখন আমার জানালার পাশ দিয়ে রোজ রোজ হেঁটে যেতেন, শুধু এই ছবিটা দেখার জন্যই জানালায় মাথা গলাতাম।'

আগের রাত্রের শহরের কয়েকটা টুকরো দৃশ্য, কথা- চোখের সামনে নাচতে থাকে।

শহরের শেষ দোকানের চারকোণা উজ্জ্বল আলো... মিলার কনসার্টের ঝমকালো পোস্টার... টুকরো জটলা... 'এবার শহরে ভয়াবহ বন্যা আসবে', 'ইশ! শহরে কেন যে একটা তালগাছ নাই, থাকলে অন্তত বাবুই পাখির বাসায় আশ্রয় নেওয়া যেত'...

শহরে সবাই সে মহাপ্লাবনের আশংকায় প্রহর গুণে; সে চিরকুটটা আবার পড়ে...

আবার পড়ে...

শহরে একটাও বাবুই পাখির বাসা না থাকুক,

অন্তত সে এক জোড়া মায়াবি চোখ খুঁজে পেতে চেয়েছিল; যে চোখ শুধু সুয়েটারের দৃষ্টিনন্দন ছবিতে ক্ষণিকের স্বপ্ন আঁকে না, ছবির উপরে যে মুখ, সে মুখে সবুজ দ্বীপ খুঁজে পায়! সে দ্বীপে থাকবে হাজারে হাজারে বাবুই পাখির বাসা...

২০১৪

বিজয় দিবস বিষয়ক একটি গদ্য কবিতা

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে একটা কবিতা পয়দা করার উদ্দেশ্য নিয়ে স্মৃতিসৌধের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। পথে পতাকা খচিত রিকসা, অটো রিকসা, প্রাইভেট কার আর মানুষের ভেসে যাওয়া স্রোতে আমিও গা ভাসাব কিনা সেই সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই বেলা দুপুর গড়িয়ে বিকালে পা রাখল।

এই সিদ্ধান্তহীনতার সময়টুকু কাটালাম একটা চায়ের দোকানে। চা'র দোকান মানে, বিভিন্ন মানুষের বিশাল বিস্তৃত জীবন কাহিনির টুকরো টুকরো গল্পের মজলিশ। তারা গল্প বলে যায় কোন এক খাংকি পাড়ার ধারালো ছিলানের; একজন হাসতে হাসতে শামসুর দোকানের সাইনবোর্ড খুলে ফেলা নিয়ে গল্প বলে, যা গতকালও কী গৌরবে সিনা টান করে দাঁড়িয়ে ছিল তার দোকানের সামনে; তারা বলে, সাইনবুট লাগাইছে হুদাই, সাইনবুটের ভিত্রে যা লেহা আছিল তার কিছুই আছিল না তার দোকানে। এক বৃদ্ধ কলিকাল জনিত রোগে ভোগা এক নাবালেকের গল্প বলে যায়, সে তার সামনেই ভুসভুস করে বিড়ি টানে— এই তার রাগ। আরো শত শত রহিম করিম যদু মধুর গল্প বলে যায় তারা। সবগুলোই ভাঙ্গা ভাঙ্গা। কিন্তু আজ যে মহান বিজয় দিবস, সেসবের নামগন্ধ নেই তাদের সেইসব গল্পে। আমি তাদের সেইসব ভাঙ্গা টুকরো গল্পগুলো পকেটে পুরে রাস্তায় নামি, তখন বিকেল।

মনটাই খারাপ হয়ে যায়। মনে পড়ে, ৪০ বছর আগে যুদ্ধ তো এরাই করেছিল; অথচ আজ এত উদাসীন কেন? যে রিক্সাওয়ালার রিক্সার মাথায় এখনো পতপত করে উড়ছে পতাকা, সেও গল্প জুড়ে দিয়েছে কোন মহাজনের বউ ইয়া খাসি, মহল্লার কার পোলায় ফাইভের ছেমড়ি নিয়ে ভাগছে— এইসব। অথচ টিভিগুলো জয় বাংলার গান গাইতে গাইতে এখন ক্লান্ত; ধুকছে পোষা কুকুরের মত।

একটু পর যখন রাত নেমে আসবে, পকেট থেকে সেইসব গল্পের টুকরোগুলো টেবিলের উপর ছড়িয়ে দেব। তারপর সেখান থেকে কাঁচি দিয়ে

কেটে কেটে আলাদা করব, তারা কী প্রক্রিয়ায় ভুলে গেল একাত্তর, হলোকাস্ট আর দেশ।

কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। রাত্রে হয়ত দেখব, স্বপ্নভঙ্গ হতে হতে ক্লান্ত কোন বৃদ্ধ ঘুমিয়ে পড়েছে বউ আর ছেলের কোলে; দেখব, নবীন মানুষ সেই রিক্সাচালক জানেই না একাত্তর কীভাবে অস্তিত্ব সংকটের জন্ম দিয়েছিল এদেশের অধিকাংশ মানুষদের মনে; সে একাত্তর বলতে বোঝে— মা বোনের সুড়সুড়ি মার্কা কিছু ধর্ষণের দৃশ্য, মান্নার সিনেমার মত সুন্দর গোলাগুলি, শেখ মুজিবের ভাষণের মরচে ধরা টেপ রেকর্ড। তার খ্যাপ নিয়ে চিন্তা আছে, দোকানির বেচাকেনা নিয়ে যেমন; আর সকলেরই কোন না কোন ব্যস্ততা আছে; অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার দায় আছে। হয়ত এইসবই খুঁড়ে পাব সেসব গল্পাংশে।

হয়ত, আরো কিছু পাব, যা কেউ আর ভুলেও মুখে উচ্চারণ করে না, তা অভিমান। তীব্র অভিমান। দেশের প্রতি। তারা ত যুদ্ধ করেছে। অথচ তারা খুবই সাধারণ মানুষ। তাদের কাছে পাকিস্তানও যা, বাংলাদেশও তা— অথচ কেন তাদের যুদ্ধে নামতে হল, জীবন দিতে হল, ভিটা ছাড়তে হল? অতঃপর তাদের যে স্বপ্ন দেখিয়ে ভারত পালানো থেকে নিবৃত করে মরণ যুদ্ধের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে স্বপ্নগুলোকে তারাই আবার চুরি করে নিঃস্ব করে রেখে গেল।

যে দোকানি একাত্তরে গোলাবারুদ আর গ্রেনেড সাপ্লাই দিত, তার ছেলেরা তাই হয়ত বিজয় দিবসে কোন এক ছেলানির শিশ্নচোষার গল্পে মেতে থাকে। ওদিকে স্বপ্নচোরেরা স্মৃতিসৌধে মহাসমারোহে গিয়ে পুষ্প অর্পণ করে আসে। এইসবের মধ্যে আমার অনাগত কবিতারা ভারি দীর্ঘশ্বাস, তীব্র ঘৃণা, কঠিন অবজ্ঞা আর অভিমানের পায়ের তলে চাপা পড়ে যায়; অন্ধকারে থু থু ছিটায়।

২০১৪

বিষাক্ত চুমু

প্রেমহীন বালিকার ঠোঁটে চুমু দিতে দিতে এখন আস্ত চুমু ব্যাপারটার প্রতিই ঘেন্না ধরে গেছে।

এখন চুমু দিতে গেলেই মুখের গন্ধ আর থুতুর খিতখিতে ছড়াছড়িতে বমি চলে আসে।

প্রেমহীন বালিকার ঠোঁট এমনি বিষাক্ত!

হয়ত, সে ঠোঁটের বিষ লালার পিঠে সওয়ার হয়ে ছুটে চলে যাবে পাকস্থলিতে, একদিন!

তারপর গড়ে তুলবে রাজ্য, বিস্তার ঘটাবে তার সাম্রাজ্য, সেখানেই।

এবং, একদিন, সেই বিষাক্ত চুমু দলবল নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে ছুটতে থাকবে হৃদয়ের পথে, সারারাত।

সেই হৃদয় নগরীর রানীহীন, নগর-রক্ষীহীন ফটক পেরিয়ে কী অবলীলায় তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়ে বের হয়ে আসবে, বীর- মহাবীর সাজে!

হয়ত দেখবে, এক ডানা ভাঙা শালিক নগরের বিষণ্ন দেয়ালে একপায়ে দাঁড়িয়ে,

ধ্যানস্থ, নিজের মনের গহীনে,

যেন এক প্রাচীন ঋষি।

এইমাত্র রাজ্য জয় করা আমাদের মহাবীর এক কোপে হয়ত কেটে নিবে বিষণ্ন শালিকের মাথা;

যে শালিক ভালবাসাহীন পৃথিবীতে একা বাঁচতে চেয়েছিল।

তারপর, সে ভোরে আমি হৃদয় হারিয়ে হয়ে যাব আস্ত এক খুনী।

পৃথিবীর সমস্ত প্রেমিককে খুন করার উদ্দেশ্যে শালিক হয়ে উড়াল দিবো,
এই বাংলার কোনো এক ঝিলের ওপর নুয়ে পড়া সজনে গাছের বাঁকা ডাল ছেড়ে।

২০১৫

বোধি মৃত্যুর কামনায়

এই দ্যাখো, মৃত্যুরও কত রঙ!
রঙে রঙে ঢেউ খেলানো রঙিন মিছিল-
দেশকে উদ্ধার করবে বলে
ওরা যখন স্টেনগান হাতে নিয়ে ছুটল,
পেছন থেকে একটা বর্বর গুলি করে দিলো এফোঁড় ওফোঁড়
কিংবা উত্তেজিত রক্তপ্রবাহ রাজপথ কাঁপাতে গিয়ে
একটা স্বৈরাচারি বুলেট তোমাকে যখন মাটির বুকে স্তব্ধ করে দেয়-
তখন দেখতে পাই, সবুজ সন্ধ্যার বুকে লাল শাড়ি পড়া বঁধুদের মত
লাল রঙের মৃত্যুরা নৃত্য করে বেড়াচ্ছে।

আজকাল 'গুম' শব্দটার বড্ডো বাড় বেড়েছে-
শুয়ে ছিল এতদিন।
আর এখন সবার নাকের ডগার উপরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে;
দেখতে পাই 'গুম' করে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার পর ভীত শঙ্কিত পিপাসার্ত দুটি চোখ সাদা হয়ে আছে...

নাহোক তোমাকে ছোঁয়া,
নাইবা হল শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সূর্য স্নানে অবগাহন,
জীবনের না- পাওয়া স্বপ্নগুলো হয়তো দাঁত বের করে ভেঙচি কাটবে আমায়।
তাই বলে রক্তে বিষ ঢুকিয়ে কিংবা ঘুমের মাঝে ঘুমিয়ে পড়ার পরিকল্পনা আঁটতে হয়, বোকা?

অভিমানে অনন্তের বুকে হারিয়ে যাবার পর নীল মৃত্যুরা যে কী নৃত্যই না করে জীবনের চারপাশে,
তুমি কি দেখো নি?

চুপাচাপ কেটে পড়ার মত ফ্যাকাশে মৃত্যুও তো দেখলাম কতশত!

হে সখা,
বোধি জীবনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে
দিগন্তের বুকে মিলিয়ে যাওয়ার আগে
তুমি যখন হিম-শীতল দৃষ্টি ফেলো
জীবনের পথপানে,
তোমাকে বীর বলে মাথা নুয়ে আসে আমার।

শেষ দিনের শেষ সূর্যের আলোয় স্নান করার স্বপ্নটাকে পেরিয়ে যেন
সখা, তোমার মতোই গভীর গোপনে হারিয়ে যেতে পারি আমিও-
রঙহীন বোধি মৃত্যু-
দিন রাত শুধু এই প্রার্থনাই করি।

মার্চ, ২০১২

বিবর্ণ শৈশব

জেরি ছিল মেয়েটার ছোট্ট বেলার খেলার সাথি,
আর তার সাথেই ফুটাত গল্পের সমস্ত ফুলঝুরি;
মানুষ নয়, কাপড়ের পুতুল!
তার সমস্ত শৈশব তার কাছে গচ্ছিত রেখে রোজ ঘুমাত,
একদিন যখন বুড়ো হয়ে যাবে,
সেদিন তার কাছে গিয়ে চাইবে তার সমস্ত শৈশব বেলা-
এই ছিল মনে আশা!

কৈশোরটা স্বপ্নের ভেতর সাঁতরে তারুণ্যের
সৈকতে পা দিল-
তারপর কেটে গেলো অজস্র সব মুহূর্ত!

অনেক কাল পর আজ তার জেরির কাছে গেল, বর্তমানটা বড্ড নিরস লাগছে তাই!
আর বয়েসটাও তো কম হল না;
নাতিরা এখন রোজ সাইকেল চালিয়ে ঘরে ফেরে;
ভাবল, যাই শৈশব থেকে ডুব দিয়ে আসি!

গিয়ে দেখে বিশ্বাসঘাতক জেরিটা বেমালুম গায়েব করে ফেলেছে তার শৈশব!
আজন্ম বোবা চোখে শুধু তাকিয়ে আছে,
রংটাও আর নেই সেই রঙিন উজ্জ্বল!
গায়ে লেগে আছে শুধু প্রথম সূর্যের বর্ণচ্ছটার মতো শৈশবের কোমল আর কিছু রঙিন আভা!

২০১৪

বৃক্ষ বন্দনা

আমি একদিন জীবনের কাছ থেকে বিদায় নেব।
আমার জীবনের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে;
এই যেমন, ১৭টার মতো বৃক্ষ রোপণ করে যাওয়া।
এই বৃক্ষের জাত হবে বিদেশি,
আর জন্মাবে দেশজ মাটিতে।
এটা মূলত স্বপ্ন-
মানে, স্বপ্নের ভার ঘাড়ের উপর থেকে মাটিয়ে ছুঁড়ে ফেলার আগপর্যন্ত মুক্তি নাই;
রোপণ শেষ হয়ে গেলেই মুক্তি!
তারপর জীবনটাকে জীবনের মার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে নির্ভার আমি চম্পট...

রবীন্দ্রনাথ আমার এই অভিপ্রায় শুনে স্বর্গে বসে কী বলবেন, জানি...
বলবেন, বোকা! তুমি বৃক্ষ বন্দনায় জীবনটা নষ্ট করে দিলে?
মৃত্যুর পর সেই বৃক্ষের ডাল ধরে কে ঝুলে থাকল,
অথবা কে ফল খেয়ে গুণগাণ গাইল, তাতে তোমার কী?

জানি।
তবুও মানুষ স্বপ্নের পুকুরে একবার ডুবে গেলে
ক্রমাগত জলকে বাতাস ভেবে তা নিঃশ্বাসে গ্রহণ করাই তার নিয়তি।
তারপর, হয় মৃত্যুর আগপর্যন্ত জল খাও
নয়ত সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছাও...

২০১৫

দুধের সরের মত ঘন রাত্রি অথবা একাকিত্ব

সন্ধ্যা রাত্রির কোলে মাথা রাখলে-
এ শহরে ভয়াবহ লোডশেডিং শুরু হয়;
আর তোমার আত্মা প্রেতের মত এগিয়ে আসতে থাকে আমার দিকে!
আসতে থাকে... আসতে থাকে...
তোমার পদহীন সেই পদশব্দ যত এগিয়ে আসতে থাকে,
আমার ভয়েরা তত আমাকে ঝাপটে ধরে...

এদিকে স্মৃতিরা মন খারাপ করে!
আমি হাত নেড়ে বিদায় জানাই আনন্দ আর ফুর্তিকে;
ততোক্ষণে স্মৃতিরা গোল হয়ে ঘিরে বসে গেছে,
তাদের প্রত্যেকেরই দাবিঃ আমার গল্পটা আগে শুনো...
আমি তোমার মনের সমুজ্জ্বল মাছ!

রাত যত বাড়তে থাকে,
সব মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে,
সব বাতি নিভে যায়...

ঘন হয়ে আসে অন্ধকার!
ভেংচি কাটে তোমার ভৌতিক ছায়া!
আর শুধু জেগে থাকে স্মৃতিগুলোর হই-হুল্লোড়!

আমি দুঃস্বপ্ন কবলিত হয়ে অন্ধকারে তোমারে হাড়তায় স্বস্তির নিঃশ্বাস নেব বলে...

২০১৩

শিরোনামহীন

অন্ধকার বাঁশঝাড়ের কিনার জুড়ে টলমল একফোঁটা নিটোল জল—

নিচে বুকের লোমের মত কালো জলে ভরা পুকুরে একদা যখন টুপ করে পড়ে গেল,

স্থির জল কী এক অজানা ভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠেছিল।

তবুও, সঙ্গিনীর সাথে বিহাররত সোনালি মাছগুলো অবজ্ঞা করে গেছে আগ্রহভরে...

হে মৎস!

আমি মৎসভুক মাছরাঙা নই।

চেনা মানুষদের ভিড়ে যেমন মিশে থাকে আততায়ীর কোমল নিঃশ্বাস,

আমি ওমনও নই গোপন হন্তারক রাক্ষুসে মাছ!

তবু, ভীত সন্তস্ত্র ডানকিনের মত দূর থেকে দূরে, ক্রমশ আদুরে দূরত্বে, কেন পথ চলা!

আমি তো মৃত্যুর ভগিনী নই,

বরং, রাতের অবসানে যে নতুন দিনের জন্ম হয়, তার রোদ মাথায় চড়িয়ে পার করে দিতে চাই শীতের বিকেলের রৌদ্র...

সারা রাত কাকচক্ষুজল নদীর কিনার ধরে হেঁটে পৌঁছে যাব রোদ্দুরের সিথানে,

আর ডুমুর ফলের সাথে হেসে লুটোপুটি খাওয়া জ্যোৎস্না আমাকে শিখিয়ে দেবে জীবনের ভাঁড়ার শেষ করে কীভাবে চাঁদের কাছে ধার দেনা করতে হয়...

তবু কেন এই অনড় অবিশ্বাস!

২.

না, কোনো নেই দাবি দাওয়া;

মগ্ন শিল্পীর মত বসে রবো খালি ক্যানভাসের সামনে-

পটে ঢেলে দেবো মায়াবি কৌটার সবটুকু হলুদ রঙ, তুলির কয়েক আঁচড়ে জন্ম দেব তোমার সবুজ শাড়ির ধূসর প্রান্তর;

চোখ জুড়িয়ে যাবে আর শিহরণে কেঁপে কেঁপে ওঠব যখন তোমার ছুটে চলা আঁচলের হাওয়ায় দুলে ওঠবে হলুদের ঢেউ!

বহুদূর থেকে ছুটে এসে যখন

এই শীর্ণ কাঁধে রাখবে তোমার মুঠো মুঠো ক্লান্ত তপ্ত নিঃশ্বাস,

যেন যত্ন করে তুলে রেখে দিতে পারি আগামি ভোরের আকাশে ছড়িয়ে দেবার আশায়।

হালকা বাতাসে ভেসে বেড়ানো শিমুল তুলো হয়ে যখন তোমার মাথায় গিয়ে বসলাম,

সযত্নে কোমল হাতের চাপে অজস্র বার মরে মরে সহস্রবার জন্ম নিচ্ছিলাম প্রতি মুহূর্তে।

ভুলে গেলাম অহংকারী চড়ুই পাখির মান অভিমান-

নীড় ফিরে পাওয়া পথভ্রষ্ট পাখির মত নিশ্চিন্তে মাথা রাখলাম কোমল কাঁধে...

কখনো কখনো ভুলে যাই শরতের কাঁশফুলের নস্টালজিয়া,

অথবা, গুলিয়ে ফেলি তার কোমলতা, তোমার মমতা আর ভালোবাসায় ভরা শতবর্ষী শিষ স্বপ্নের মত তীব্র কোমলতায় ভরিয়ে দিলে;

বস্তুত, আর কোন জলে ভেজার প্রয়োজন হয় না।

তোমার মাঝে ডুব দিলেই সমস্ত শরীর শিহরণে কেঁপে কেঁপে ওঠে!

৩.

যদি কোনোদিন ডানাভাঙা ফিঙের মত পথ হারিয়ে যাই জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,

সঙ্গীহারা চড়ুইয়ের মত খুঁজে ফেরো না আর বন-প্রান্তরে...

বরং, মাছরাঙা হয়ে শান্ত পুকুরে পুঁতে রাখা মৃত ঢালের কিনারে বসে থেকো,
তাকিয়ে থেকো জলের উপর পড়া ঈষৎ কম্পমান তোমার ছবির দিকে,
যেন জলরঙে আঁকা বিষণ্ন কাজলরেখার মুখ-
পেয়ে যাবে আমায়।

ডিসেম্বর, ২০১২

বোকা বলাকা

জলাশয়ের ঘোলাটে জলে কতশত পোকামাকড় যে ঘুরে বেড়ায়
তার কি হিসেব রাখা যায়, বলো?
নিস্তরঙ্গ জলের তল থেকে কোনো কোনোটা বা মাথা ভাসিয়ে দেয়,
টুপ টাপ শব্দও করে অবিরাম-
মাঝে মাঝে দিকভ্রান্ত পাখিগুলো
উঁকি দিয়ে আবার দিগন্তের গায়ে মিলিয়ে যায়!

ডানা মেলে সে উড়তে চাইল
বিশাল শূণ্য আকাশে
মায়ের কোলের মত নিরাপদ ঝোঁপঝাড় ছেড়ে ডানা মেলল
আকাশের বুকে-
শূণ্যতার বিশাল আকাশ।
পেছনে পড়ে রইল প্রিয়তমা
আদুরে সন্তান আর
চিরচেনা প্রতিটা পত্র-পল্লব।

মনে পড়ে গেলো
ছেড়ে আসার সময় চুমো দেওয়া হয় নি
প্রিয়তমার গালে
মাথায় আদরের পরশ বুলিয়ে দেওয়া হয়নি প্রাণের অধিক সন্তানটিকে।

এখন শুধুই অপেক্ষার পালা-
কারোর পাকস্থলিতে অনন্ত নিদ্রায় তলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা...
ধ্যাত্, পুঁটিটি তো ভালোই ছিলো;

হৃষ্টপুষ্ট আর কী সুদর্শন!
জলের গায়ে মাথা নেড়ে
চপাচপ শব্দে যখন নাচছিল
কী মায়াকাড়া ছন্দই না তুলেছিল
আমার মনের গভীর গহীনে-
আর ভুলে গেলাম প্রিয়তমার মুখ।
একাই সাবাড় করতে চাইলাম এক মনে...

পড়ন্ত বিকেলের নরম রোদ
হারিয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যার শীতলতার বুকে
আকাশটা ঢেকে যাবে কালো চাদরের মোড়কে এই একটু পরেই।
আর তার ভুবনেও নেমে আসবে
গভীর অনন্ত রাত্রি...

বোকা বলাকা-
কাঁদো এইবার শূণ্যতার কাঁধে মাথা রেখে-
কাঁদো তুমি;
অনন্ত রাত্রির বুকে ঘুমিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত কাঁদো...

২০১২

আগন্তুক

ঝিম-ধরা সকালে একটা কাক এসে বসে
জানালার ওপারে লাইটপোস্টের তারে;
সময় বয়ে চলে-
সফল মানুষেরা তখন রাস্তায়,
উদ্বিগ্ন মুখে ছোটে;
আচ্ছা, নিত্য ওরা যায় কোথায়?

পিঁপড়ের মত চারপাশে বয়ে চলে সকল জীবন।
অন্ধকার কোণে আমিই শুধু স্থির,
শৈশবে ফেলে আসা ডাহুকের বিষণ্ন কান্নায় ডুবে আছি,
ডুবে যেতে যেতে খুঁজে ফিরি একটা রঙিন মাছ;
জীবন বয়ে চলে চারপাশে,
একটা রঙিন মাছের জন্য তবুও জলের তলে গড়ে তুলি ক্রমাগত অস্থির আবাস।

দিন ফুরিয়ে এলে সন্ধ্যা আমার জানালার কাঁচে মুখ ঘষে,
তার থেকে কাকেরাও উড়ে যায়,
বিচিত্র আধিভৌতিক শব্দ নিয়ে রাত্রি তখন দরজায় অনিবার্য কড়া নাড়ে-
জলের নিচ থেকে মাথা তুলে একটা বিষণ্ন প্রশ্ন ছুঁড়ে দেইঃ কে ওখানে?

শহুরে ভোর মুচকি হাসে, ‘ওঠো, জীবনের ঠাপ খাও! তোমার হয়ে কে খাবে, শুনি?'

তখন, কোলাহল-ভীত স্কুল পালানো বালকের মত ভয়ার্ত আর বিধ্বস্ত চোখে তাকিয়ে থাকি সকালের আলোর দিকে, নিরুপায়!

২৬ ফেব্রুয়ারি, ’১৫

অকবিতা

অন্য জীবন

অবন্তী,

দ্যাখো, টিকটিকিটা কী সুন্দর দেয়ালের গায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে! পায়ে নিশ্চয় চুম্বক আঁটা আছে। দেয়ালের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত বীরদর্পে হেঁটে বেড়ায়। মাঝে মাঝে থেমে যায়, যেন, যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর বেরিকেডে আটকে পড়ে গেছে আর এই মাত্র জেনে গেল তার সব শেষ হতে চলেছে। হতাশ হয়ে সব আশা ভরসা ছেড়ে দিতে চাচ্ছে। নাহ! সে নিজেই তো দেখছি আরেকজনকে বধ করার জন্য শিকারে আছে!... শুধু শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে টিকটিকিটাকে আর ল্যাম্পের চারপাশে উড়ে বেড়ানো মশাগুলো; অথচ এই কয়েকদিন আগেও এদের টিক টিক শব্দের যন্ত্রণায় টেকা দায় ছিল। হাতের কাছে যা ই পেতাম তা ই ছুঁড়ে মারতাম। আর মশার কামড়ে অতিষ্ট হয়ে মশার চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতাম।

পড়ন্ত বিকেলের নরম রোদ গায়ে মেখে সারাটা মাঠ ঘুরে ফিরতে ইচ্ছে করছে। কয়েকজনকে দেখলাম মুখ গোমড়া করে কোথায় যেন চলেছে... পাশ ফিরে তাদর চলে যাওয়া দেখলাম; কী সুন্দর একটা বিকেল অথচ এদের মুখ এত ভারি কেন?

আরে ধ্যাত্! আজকে সময় যেন খেয়ে না খেয়ে একেবারে দৌঁড়িয়ে দৌঁড়িয়ে চলছে। এই একটু আগে বিকেলে বারান্দায় বসে ছিলাম আর দ্যাখো, বেয়াদপ সন্ধ্যা পা টিপে টিপে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিকেলের গা জড়িয়ে ধরছে... আচ্ছা আজ কী কারোর আসার কথা ছিল? আশ্চর্য কে আসবে আবার এই মুখপোড়া হনুমানটাকে শেষবারের মত একটু দেখতে? জানি, কেউ আসবে না। যার

আসার কথা ছিল সে যে আজ পৃথিবীর কোন কোণায় পড়ে আছে তার ই খোঁজ রাখি না বহুকাল...

সন্ধ্যাটা যে আলগোছে রাত্রির পায়ের পাতায় জেঁকে বসেছে, ঠিক খেয়াল করিনি। আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা... বড় জোর ২ ঘন্টা!

আর হয়তো দেখা হবে না চিরচেনা এই আকাশ আর এই অগণিত তারা, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি শেষ হয়ে যাবে তবুও একা একা কেউ রাতভর সন্ধ্যাতারার সাথে জমিয়ে গল্প করবে না- প্রিয়তম তারা, তুমি ভালো থেকো।

হয়তো নাগরিক কোলাহলের ভিড়ে একদিন ভুলে যাব, আমিও রাত্রি নামার সাথে সাথে জোনাকির পিছু পিছু ছুটতাম; আর কাঁচের বোতলে পুরে দেখতাম আলোয় আলোয় বোতলটা ভরে ওঠেছে কিনা। তখন বন্দী জোনাকিরা বেদনায় যে নীল হয়ে যেত, তা আর নজরে আসে নি। তাদের কষ্ট পুড়ে আলোকিত হত চারপাশ- শুধু তার রূপ ই দেখেছি। আজ অনেককাল পর যখন তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, কাঁচের বোতলের গায়ে লাফিয়ে বেড়ানো সাদা সাদা আলোকগুচ্ছের গভীরে আসলে নীল আলোর ফোয়ারা। নাগরিক কোলাহলে একদিন হয়তো প্রিয় জোনাকির এই নীল কষ্টও আর স্পর্শ করতে পারবে না। সময় সবুজ ডাইনির মত- রূপ গন্ধ মায়ায় ফেলে একদিন অতীতের প্রতি সমস্ত আবেগ অনুভূতি ভুলিয়ে দ্যায়। আজ যা জীবন্ত বর্তমান কাল যখন এই বর্তমান অতীত হয়ে যাবে- তখন তা জীবনের একমুঠো গল্প হয়ে যাবে- অথচ, কালই এই গল্পটা ছিল আমাদের জীবন!

তাহলে জীবন আসলে কী? কোনো গন্তব্যের দিকে ছোটা কোনো মিশন? নাকি জাস্ট সময়ের যোগফল? হয়তো, না- বিয়োগফল না- যোগফল। শূন্য হতে জন্ম শূন্যেই বিলীন। আমরা কি তবে আমৃত্যু শূন্যতার বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছি? "যেখানে ফুল আর পশুর পায়ের দাগ একই অর্থবহ!'' জীবনের তবে কোনো অর্থ নেই? কী কুৎসিত একটা প্রশ্ন! বোকা, অর্থ থাকবে কেন জীবনের? অর্থ ছাড়াই জীবনটা কত সুন্দর। আর এই সকল সৌন্দর্য কদর্যের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে শূন্যতায় বিলীন।

কে যেন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলোঃ

'মৃত্যু কী?'

‘জন্মের জারজ জমজ ভাই!'

‘উহ্!'

‘আমার মনে হয়- ঘুম। সব ভুলে তলিয়ে যায় মহাশান্তির গহ্বরে।'

‘আমরা কি তাহলে প্রতিদিন মারা যাচ্ছি?'

‘স্বপ্নহীন ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা মরে যাই। ঐ ঘুমের মাঝে আমাদের কোন বোধ থাকে না। আমরা যে মানুষ, ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা হেসেছি কেঁদেছি কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি করেছি ঈর্ষায় জ্বলেছি কাল কি করব এই চিন্তায় মুখ কালো করে রেখেছি- এসবের কোনো বোধ থাকে না। আছে শুধু সুখের যন্ত্রণা আর দুঃখের যন্ত্রণার বোধহীন সুখ। নিশ্চিন্তির সুখ। জীবনের ভার আর বহন না করার নিশ্চিন্তি। বোধহীন শীতকারের শিহরণ!'

‘তাহলে এই যে রাজনীতি সমাজনীতি দেশনীতি জগতনীতি- এইসব নীতি নিয়ে নেতাগিরি ফালাফালি?'

‘সব বা..ল!'

‘জীবন হচ্ছে, জীবনানন্দের কবিতা। শীতরাতে যা নক্ষত্রদের ওমে জেগে থাকে।'

২.

আরে ধুর! দ্যাখো! কীসব আবুল তাবুল ভাবনারা এসে যে ভীড় জমায়! আসুক সময়। আমি চাইলেও আসবে, না চাইলেও আসবে। বরং সেই আগত সময়ের জন্য নিজেকে তৈরি রাখা ই ভালো...

আহ, কী সুন্দর বাতাস! চোখের পাপড়ি দুটি পরস্পর পরস্পরকে শক্ত বাঁধনে জড়িয়ে ধরার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠছে... এই রাস্তার একদম শেষে যে বাড়িটি একা দাঁড়িয়ে আছে তার দুই বাসিন্দা এইমাত্র চলে গেল। মা বলতেন, ‘একদিন আমরা কেউ থাকব না, তুই একা হয়ে যাবি। কেমন লাগবে তোর?' মা কবেই চলে গেছেন। এখন এই শূন্য বাড়িতে আমি একা আর কয়েকজন; বুড়ো বাবা ছোটো এক ভাই। মেজোটি যেবছর মারা গেছে সেবার আমার এই বাড়িটির গায়ে নতুন রঙ ওঠল। আমরা বাবাকে বুঝাচ্ছিলাম যে, কেউ মারা গেলে রঙের উৎসব করতে নেই। বাবা শোনলেনই না। বরং, পেটের পিড়ায় কঁকাতে কঁকাতে

মা এক বর্ষায় বিছানা নিলেন, বাবা কী নিষ্ঠুরভাবেই না মাকে ধমকিয়ে কান্না থামাতে বলেছিলেন। মাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়নি। অনেক টাকা লাগে যে!

চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় ঘুমিয়ে পড়া এক মুহূর্তের ছবি।... একটা পিচ্চি পুকুরে সাঁতার কাটছে। তার মা কন্চি হাতে পুকুরের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কী যেন বলছে! কী বলছে?

'ওঠ আইজ! আইজ তোর একদিন কী আমার একদিন!'

ছেলেটি ভয়ে কয়েকটা মেয়ের মাঝে লুকায়। কী ভালো আপাগুলো! তারা তাকে লুকিয়ে রাখে...

'কারে খোঁজেন জেঠি? নাই তো এইখানে। কহন ওইঠা গেছে!'

আচ্ছা, আপাগুলা আজ কোথায়? কতদিন দেখে না সে তাদের!

অনেক ছবি। জল রংয়ের। তেল রংয়ের। স্কেচ। রং ওঠে এখন সবই ধূসর। যেন পেন্সিলে আঁকা নিরর্থক আঁকিবুকি।

'এখনো বসে আছো? ওঠ!'

কর্কশ কন্ঠস্বরে ধ্যানমগ্ন খেয়ালি ভবঘুরের ধ্যান ভাঙে। ওহ! তা ই তো! আমাকে তো ছুটতে হবে। গল্প হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ছুটতে হবে। সাদা কাগজে অহেতুক আঁকিবুকি হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হাঁটতে হবে... অবন্তী, মহাশূন্যতার বুকে চিরতরে বিলীন হবার আগ পর্যন্ত দৌড়াতে হবে... কিন্তু আমি যে জীবনের ইঁদুর দৌঁড়ে অংশগ্রহণ করতে চাই না। আমি ঘরকুণো হয়ে দেয়ালে টিকটিকির শিকার করা দেখতে চাই।

ইতি-

সতীর্থ

২০১২

আদিম সীমাবদ্ধতা

অবন্তী,

সাপ্তাহিক ২০০০ ম্যাগাজিন বন্ধ হয়ে যাবার পর সবার হায়-হুতাশ থেকে জানতে পারি, এটা অসাধারণ ম্যাগ ছিল; এর আগে একে নিয়ে কারোর এক লাইন লেখা পড়েছি কিনা মনে পড়ছে না। কেউ মারা গেলেই কেবল তিনি পাদপ্রদীপের তলে চলে আসেন, তার আগে তাকে জানা হয় না— আর তখন আফসোস হয়ঃ ইশ, কেন যে তাকে আগে জানি নি!

কাফকা, জীবনানন্দ, বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, অডেন, মানিক, গঁগদের জীবিত অবস্থায় চার পয়সার মূল্য দেন নি পাঠক সমালোচক অথবা শিল্পবোদ্ধারা। আর আজ তারা কালোত্তীর্ণ প্রতিভা। যে গঁগ না-খেতে পেরে রং মেশানোর জন্য রাখা তার্পিনের তেল খেয়ে খেয়ে মরেন, আজ তাঁর একটা চিত্রকর্ম নিয়ে সারাবিশ্বে কোটি কোটি হাজার টাকার ব্যবসা চলছে; বোদলেয়ারকে ঘিরে যে আয় আর তাঁর এখন যে খ্যাতি- তা তখন পেলে, অন্তত ভাল মত চিকিৎসা করাতে পারতেন, মনেও শান্তি পেতেন— আর আমরা পেতাম ক্লেদজ কুসুমের মত আরো কোন অবিস্মরণীয় কাব্য, শেষ জীবনটাও এমন মর্মান্তিক হত না হয়ত বা; কিংবা জীবনানন্দের এখন যে দেশজোড়া খ্যাতি, তাকে ঘিরে যে ব্যবসা— তার সামান্য অংশ তখন পেলেও ট্রাম লাইন ধরে একটু সাবধানে হাঁটতেন। মনে অন্তত শান্তি নিয়ে চলে যেতে পারতেন। এখন কাফকাকে বলা হয় আধুনিক বিশ্বের বিবেক, ভবিষ্যৎ বক্তা, বলা হচ্ছে, আধুনিক পৃথিবীকে দেখা মানে কাফকার চোখ দিয়ে দেখা; তাঁর তিন পৃষ্ঠার একটা গল্প নিয়ে লেখা হচ্ছে শয়ে শয়ে বই— তখন এর সিকিভাগ মূল্যায়ন করা হলে কী এমন ক্ষতি হত মানুষের? অন্তত আজীবন হীনমন্যতায় ভোগা কাফকা মৃত্যুর আগে বন্ধু ব্রড ম্যাক্সকে বলে যেতেন না, 'আমার অপ্রকাশিত (বই হিসেবে) সমস্ত রচনা পুড়িয়ে ফেলো।' অথচ যে রচনাগুলো তিনি পুড়িয়ে ফেলার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যেই ছিল দ্য ক্যাসল, দ্য ট্রায়াল, দ্য আমেরিকা এবং অবিস্মরণীয় কিছু ছোটগল্পের মত মহান রচনা! জয়েসের যে রচনা, ইউলিসিস—কে সমকালে বলা হত 'পাগলের প্রলাপ', আর আজ

সেটাকে বলা হয় বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস; একি সাথে লেখক আর তার রচনার সাথে কী কৌতুককর পরিহাস!

কেউ মৃত্যুর পর তার দিকে যে সহানুভূতি, গুরুত্ব আর শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁকে মূল্যায়ন করা হয়, জীবিত অবস্থায় তা করলে সভ্যতার কী ক্ষতি হয়, এটাই আজো বুঝে ওঠতে পারিনি। কেউ একজন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, যারা রুদ্রকে জাতীয় কবিতা পরিষদ থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন, তারাই আজ রুদ্র মেলার আয়োজন করছে, সভাপতি হচ্ছে, বক্তৃতায় ফুল ঝরাচ্ছে। অথবা, প্রতিষ্ঠানগুলোও জানে, জীবিত মানিকের যেহেতু এক কানাকড়ি দাম নেই কাস্টমারের কাছে, তাই চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়; তারপর মৃত মানিকের জন্য সাহিত্যপাড়া যখন ক্রেজি হয়ে ওঠল, তখন তারা সদলবলে মাথায় তুলে নিল তাঁকে।

কার্ল মার্ক্স, আপনাকে নিয়ে সারাপৃথিবীর চৌদ্দপুরুষ সাম্যবাদের ধুয়ো তুলে কামিয়ে নিল কোটি কোটি হাজার ডলার, আর কিনা আপনার ছেলে-মেয়ে মারা গেল না-খেতে পেরে! আপনারা জীবিত থাকতে ছিলেন সমাজ এবং রাষ্ট্রের কাছে অভাজন, আর মৃত্যুর পর হয়ে ওঠলেন হিরো, একেকটা প্রতিষ্ঠান। জীবনানন্দ বা কাফকা বা বোদলেয়ার বা মানিক বা নজরুল বা জয়েসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠছে কত শত ইনস্টিটিউট, তাদের নিয়ে ফিচার হচ্ছে সমস্ত পত্রিকা, প্রতি বছর থিসিসের বই বের হচ্ছে গন্ডায় গন্ডায়; আর ওদিকে হয়ত বরিশালের অঁজপাড়া গায়ের কোন এক নবীন জীবনানন্দের কবিতা সমস্ত পত্রিকায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার অভিমানী হলুদ খাতা ধীরে ধীরে ধূসর পান্ডুলিপিতে পরিণত হবার প্রহর গুণছে! আরেক মানিক না-খেতে পেরে সব ছেড়ে হয়ে যাচ্ছে কোন এক গার্মেন্টসের সুপারভাইজার। আমরা সভ্য হই, পৃথিবী বদলায়—সিস্টেম পাল্টায় না। সেটা হাতে ছাপা পত্রিকার দুনিয়াতে যা, ব্লগের পৃথিবীতেও তা-ই আছে। এর নামই হয়ত আমাদের 'আদিম সীমাবদ্ধতা'!

ইতি-

সতীর্থ

২০১৫

আমি তুমি সেঃ অস্তিত্বে 'আমিত্ব বোধ'

অবন্তী,

আমি তেমন চিন্তাশীল নই, তবুও কেন যে বিভিন্ন চিন্তা পেয়ে বসে আমাকে! যখন পেয়ে বসে, তখন তাকে আর এড়াতে পারি না। গত দু থেকে তিনদিন যাবৎ একটা ব্যাপার আমাকে বিস্মিত করে রেখেছে; সেটা হচ্ছে, সেই সুদূর শৈশবে যখন আমি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম আর খুব ধেয়ান ধরে খেয়াল করতাম আমার চোখ নাক ঠোঁট দাঁত– মানে সমগ্র মুখমণ্ডল, তখন মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটা অনুভূতি তীব্র মাত্রায় বয়ে যেত ঘাড় বেয়ে, এবং আমি তখন সচকিত হয়ে আপন মনেই বলে উঠতাম, 'ও...তাই..তো!'

কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই অনুভূতিটার ভাষারূপ দিতে পারি নাই। কাউকে ঠিকঠাক মত বোঝাতেও পারি নাই। শুধু বছর তিনেক আগে, সন্ধ্যাকালীন এক আড্ডায় টিএসসির মাঠে গৌতম ভাইকে কিছুটা বোঝাতে পেরেছিলাম। সেটা হচ্ছে, আয়নায় নিজেকে খেয়াল করতে গিয়ে মনে হত, 'আমি কে?'

না না না... ঠিক এই প্রশ্নটা না...আমার মনে হত... এই দ্যাখো তোমাকেও ঠিক মত বোঝাতে পারছি না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, এই অনুভূতিটা কবিতা- পাঠ পরবর্তী অভিজ্ঞতার মত। কাউকে ঠিক বোঝানো যায় না, নিজেও যুক্তি দিয়ে বুঝে উঠা যায় না। শুধু অনুভব করতে হয়। বুঝতে গেলেই কর্পূরের মত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আর অন্যকে বোঝাতে গেলে তো আরো! অবাক করার ব্যাপার হচ্ছে, এই অনুভূতিটা আমাকে এখনো তাড়িয়ে বেড়ায়। যেমন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে গত তিন দিন যাবৎ। যাইহোক, এই বিষয়টা নিয়ে একটু পরে আসছি।

খুব ছোটবেলায় কিছু প্রশ্ন আমাকে তাড়িয়ে বেড়াত। সবকটাই জীবন সম্পর্কিত। মনে পড়ে, দাদির ঘরের চটির ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমি উদাস চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতাম। শুধু ভাবতাম। ভাবতাম, মৃত্যুর পর কী হবে? এই সমস্ত সৃষ্টিই বা করল কে? একদিন দাদি এর উত্তর দিলেন, বললেন, সব কিছু সৃষ্টি করেছে আল্লা। দাদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, তাই আল্লা বলতে চোখের সামনে ভেসে ওঠল শাদা পায়জামা- পাগড়ি পরিহিত দাঁড়িওয়ালা এক বয়স্ক লোককে। এইভাবে স্রষ্টার খোঁজ পেলাম। তারপর জানতে পারলাম, মানুষ মৃত্যুর পর হয় বেহেস্তে যায়, নয়তো দোজকে

যায়। সে সময়টা ছিল কোন এক জ্যোৎস্না- রাত। উঠোনে ফুফুর কোলে আমি বসে আছি। তখনো জানি না পরকাল বলে কিছু আছে। আমি জানতে চাইলাম, মানুষ মরার পর কোথায় যায়?

আপা আমার সেই প্রশ্নের উত্তর দিল, 'মানুষ মরার পর আল্লার কাছে চলে যায়, না ফুফু?' হুম। ভাল কাজ করে গেলে দুধের ভেতর রাখে। আর খারাপ কাজ করলে আগুনের ভেতর। তখনো কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি নি। গুরুত্ব উপলব্ধি করলাম বছর খানেক পর নানির বাড়িতে ঘরের দেয়ালে টাঙানো একটা ছবি দেখে। ছবিতে একপাশে নরকবাসী ভয়াবহ সব শাস্তি ভোগ করছে, আরেকপাশে স্বর্গবাসী কী চমৎকার সব সুখ উপভোগ করছে! এইসব দেখে- শুনে দুঃচিন্তায় খাওয়া- দাওয়া প্রায় বাদই দিলাম। তখন একটাই শুধু চিন্তা, আমি যদি দোজকে যাই?...

যেখানে যেতাম সেখানেই এই দুঃচিন্তা পিছুপিছু যেত, আমি এই পরিস্থিতি থেকে অবশেষে মুক্তি পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠি। ফলে, তখন আশ্রয় নিলাম ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠানের। ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠান পালন করে অদ্ভুত এক শান্তি পেতে থাকি। কিন্তু সেই শান্তিও কপালে সইল না। হঠাৎ করে কিছু প্রশ্ন পেয়ে বসল আমাকে। স্রষ্টা আর পরকাল সম্পর্কে আমার সন্দেহ জাগতে থাকে... এইসবের অনেক পরে, সেই সন্দেহ চূড়ান্ত রূপ পায় যখন আমি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। হুমায়ুন আজাদ তখন গোগ্রাসে গিলছি।

২.

গরুর গাড়ির উপর শুয়ে শুয়ে প্রায়ই রাতের আকাশ দেখা হত। চাঁদনী রাতের আকাশ আমার ভাল লাগে না। ভাল লাগে তারা ভরা আকাশ। এই তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন ভাবতাম, এমন কতশত কোটি সৌরজগত ছেঁয়ে আছে মহাবিশ্বজুড়ে, তখন কী এক রহস্যময় অনুভূতিতে মন ছেঁয়ে যেত। অবাক- বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তাম যখন ভাবতাম যে, এই মহাবিশ্বের কোন শেষ নেই!

এই পৃথিবীর সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু মৃত্যুর পরের সময়টা অনন্ত। আমি যখন বেহেস্তে যাব, অনন্ত কাল ধরে সুখ উপভোগ করতে থাকব। কিন্তু, ভাবনায় পড়ে যাই ভেবে যে, অনন্ত কালটা তবে কতটুকু কাল? শেষ বলে তো একটা কিছু আছে; শেষ নেই, এটা কেমন কথা? যদি শেষ বলে কিছু থাকে, তাহলে মরেও তো দেখি শান্তি নাই।

তাছাড়া, স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল? নিজে নিজে একজন কেমনে সৃষ্টি হয়? তেমনি, পরে মহাবিশ্ব নিয়েও একি প্রশ্ন যাকে; এর শেষ নেই এটা কেমন কথা! পরে জেনেছি, এইসব হচ্ছে চিরন্তন প্রশ্ন এবং এগুলোর কোন সদুত্তর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

এমনি কত শত প্রশ্ন যে আচ্ছন্ন করে রাখত ছেলেবেলায়!

৩.

মনটা অস্থির হয়ে আছে। কে দেবে আমার প্রশ্নের উত্তর। ছোট থাকতে আয়নায় নিজেকে নিরিখ করার সময় যে অনুভূতি খেলে যেত, তা- ই ইদানীং একটু একটু করে ভাষা পাচ্ছে। জানি না, কবে নাগাদ আমার সেই অনুভূতিটা পরিপূর্ণ ভাষা পাবে। তবে, যতটুকু ভাষা পেয়েছে, ততোটুকুই তোমার সাথে শেয়ার করব বলে আজ লিখতে বসা।

তোমাকে দিয়েই উদাহরণটা দেই। অবন্তী, তুমি একটা মেয়ে। স্বাভাবিকভাবেই শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে তোমার কিছু মেয়েলি বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করে যে তুমি প্রজাতিতে মানুষ কিন্তু মানুষের ভেতর সামান্য ভিন্ন আরেক প্রজাতি। এই বৈশিষ্ট্যই পুরুষ প্রজাতি থেকে তোমাকে আলাদা করেছে। এবার তুমি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও। তারপর, নিজেকে নিরিখ করে দেখো। দেখো চোখ, দেখো ঠোঁট, দেখো নাক দাঁত কপাল চুল... এই প্রত্যঙ্গগুলো তোমাকে অন্য মানুষ এমনকি অন্যান্য মেয়েদের থেকে আলাদা করেছে। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? তোমার থেকে অন্যান্যদের শারীরিক পার্থক্যটা শুধু জ্যামিতিক। তোমার প্রত্যঙ্গগুলো কেবল অন্যান্যদের থেকে এদিক- সেদিক। আমাদের এই দেহগত পার্থক্যটা ভৌগোলিক আর জিনগত। এই জ্যামিতিক পার্থক্যটা তুলে দিলে তোমার সাথে আসলে পৃথিবীর আর সব মেয়ের কোন পার্থক্য নেই। তেমনি, আমিও পৃথিবীর আর সব পুরুষের মতই। একইভাবে, আমার আর পৃথিবীর আর সব পুরুষের অথবা তোমার আর পৃথিবীর সব মেয়েদের মধ্যকার মানসিক পার্থক্য যে থাকতে পারে সেটাও সাংস্কৃতিক এবং জিনগত। এই মানসিক পার্থক্যটা শুধু 'ধরণে'; অমুক এইভাবে বলে, তমুক অইভাবে চলে, সে এই রকম চিন্তা করে, তার মানসিকতা এই রকম... এইসব ধরণ। কারোর সংবেদনশীলতা তীব্র এবং বিস্তৃত, কারোর সংবেদনশীলতা ভোঁতা এবং সংকীর্ণ। কারোর চিন্তা বহুগামী, কারোর চিন্তা একমুখী।

কিন্তু এক মানুষের সাথে আরেক মানুষের প্রধান পার্থক্য এবং সাদৃশ্য হচ্ছে, 'আমিত্ব বোধ'- এ! অবাক হচ্ছো? একটা জিনিস একিসাথে কী করে পৃথক এবং সদৃশ হতে পারে, এটা ভেবে? তাহলে প্রথমে 'পার্থক্য' নিয়ে আলাপ করি।

তুমি, অবন্তী! পৃথিবীর দৃশ্যাবলী চোখ দিয়ে দেখো, ত্বক দিয়ে তাপমাত্রা অনুভব কর, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নাও, জিভে দিয়ে স্বাদ, মন দিয়ে উপলব্ধি– এগুলো সবই

অতি জানা কথা। আমি এইসব করি আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে। সে করে তারটা দিয়ে। তারা অনুভব করে তাদেরটা দিয়ে...

এবার, একটা দৃশ্যকল্প কল্পনা কর। তুমি আর আমি একই টেবিলের দুই প্রান্তে বসে আছি। তুমি খাচ্ছ আইসক্রিম আর আমি গরম চা। তুমি শুনছো অর্ণবের 'হারিয়ে গিয়েছি', আর আমি মোবাইলে দেখছি মুভি। তুমি এই মুহূর্তে যে সমস্ত অনুভূতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছো, আমি তা অনুভব করতে পারছি না; তেমনি আমি যা যা অনুভব করছি, তুমি তা করছ না। দেখেছ? আমি আমার 'আমিত্ব বোধ' নিয়ে বন্দী, তুমি তোমার 'আমিত্ব বোধ' নিয়ে বন্দী। প্রাচীনকালে অপরাধীদের ভয়ানকভাবে শাস্তি দেওয়া হত। তাকে এনে দাঁড় করানো হত স্টেডিয়ামের মাঝখানে তারপর সেখানে ছেড়ে দেওয়া হত হিংস জন্তু- জানোয়ার। মানুষটি প্রাণপণে লড়াই করত জন্তুদের সাথে কিন্তু জন্তুগুলো পাত্তাই দিত না সেইসব হতভাগা মানুষদের। ছিন্নভিন্ন করে দিত একেবারে। মানুষটি প্রচন্ড যন্ত্রণা আর ভয়ে ভয়ানক চিৎকার করত; এবং টিকেট কেটে এই খেলা দেখতে আসা মানুষগুলো তখন গ্যালারিতে বসে আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠত, কেউ বা শিষ বাজাত, কেউ বা খুশিতে নাচতে আরম্ভ করে দিত।

অবন্তী, হিংস্র জন্তুদের নখর- দাঁত- থাবার নিচে সেই অসহায় আর ভয়ার্ত মানুষটির এবং গ্যালারিতে বসে আনন্দ উপভোগ করা সেইসব দর্শকদের মধ্যে মূলত পার্থক্য কোথায়, জানো? পার্থক্যটা হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে সেই মানুষটি যা যা অনুভব করছে, যে সমস্ত অনুভূতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, গ্যালারিতে বসে সেই সকল দর্শকগুলো সেই সমস্ত অনুভূতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে না। যদি ব্লুটুথের মত কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে সেই মানুষটির সেই সময়কার অনুভূতি গ্যালারির দর্শকদের মাঝে ঠিক ঠিকভাবে সঞ্চারিত করা যেত, তবে চিত্র ভিন্ন হয়ে যেত। তখন বুনো উল্লাসের বদলে ভয়ার্ত বুনো চিৎকারে ভেসে যেত পুরো স্টেডিয়াম।

পার্থক্য এটাই যে, আমরা একক সময়ে কেউ কারোর অনুভূতি অনুভব করতে পারি না। শুধু যা করতে পারি তা হচ্ছে, কারোর অবস্থা আমাদের মত করে অনুভব; যাকে বলে সহানুভূতিশীল হওয়া, কিন্তু সেটা কোনভাবেই একক সময়ে তার মত করে অনুভব নয়।

ফলে, তুমি ১৯৯৬ সালে জন্ম নিয়েছ এবং ২০৪৬ সালে যদি মারা যাও, এই ৫০ বছরের জীবনে যা কিছু অনুভব তা একান্তই তোমার। সেই অনুভবই তোমার 'আমিত্ব বোধ'! যা অন্য সবার থেকে একদম আলাদা।

এবার, মানুষের সাথে মানুষের 'আমিত্ব বোধে' যে সাদৃশ্য তা নিয়ে কথা বলি। এই অংশটুকু নিজের কাছেই সবচেয়ে দুর্বোধ্য লাগে। আমি জানি না তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব কিনা।

এই দেখো, আজকের এই ভোরে আমি বেঁচে আছি। জানালার ওপাশেই রাস্তা। জানালার এপাশে বসে আছি, আর তাকিয়ে আছি রাস্তার দিকে। ভোরের আলোয় চোখের সামনে স্পষ্ট রাস্তা, সারি সারি বাড়ি, বাড়ির সাথে হেলান দেওয়া গাছ, আর রাস্তা দিয়ে চলমান মানুষ। এইসব দেখছি। দেখতে দেখতে কখনো বা ভাবনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠছি, কখনো বা মনের ভেতর অতীতের কোন কথা দৃশ্য ভাবনা এইসব চেতনা প্রবাহে বয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো বা দিবাস্বপ্নে হারিয়ে যাচ্ছি, তখন এই যে চোখের সামনেকার রাস্তা- বাড়ি- গাছ- মানুষের দৃশ্যাবলী, এইগুলো বেমালুম ভুলে যাচ্ছি। তখন আমার মনোজগতের শব্দ দৃশ্যই বাস্তবতা। এটা একটা মুহূর্ত। খেয়াল কর, সময়টা ভোর। ভোরের এই মুহূর্তটায় আমি বেঁচে আছি। এই মুহূর্তে আমার ভেতরে যে 'বোধ' কাজ করছে, এরই নাম 'বেঁচে থাকা'। একজন মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এমনও অসংখ্য মুহূর্তের ভেতর দিয়ে যায়। এবং, সেইসব মুহূর্তগুলোয় এমন অসংখ্য বোধ জন্ম নেয়। আরো খেয়াল কর, আমার বা তোমার অথবা যে- কারোর জন্মের আগেও পৃথিবীতে 'সময়' বয়ে গেছে, আমাদের মৃত্যুর পরেও 'সময়' বয়ে যাবে। কিন্তু সেই 'সময়'- এ আমি বেঁচে ছিলাম না বলে অথবা বেঁচে থাকব না বলে আমাদের সেইসব বোধসম্পন্ন মুহূর্ত তৈরী হয় নি। এবং, হবে না।

কিন্তু, সেইসব মুহূর্ত কাটানোর সময় আমার ভেতরে যে 'আমিত্ব বোধ' কাজ করত, সেটা তোমার মধ্যেও কাজ করে। সত্যি বলতে, বেঁচে থাকা প্রতিটা মানুষই এই বোধে তাড়িত হয়। তাহলে তুমি যখন মরে যাবে, বা আমি যখন মরে যাব, বেঁচে থাকাকালীন আমার ভেতরে কাজ করা এই 'আমিত্ব বোধ' পৃথিবীর জীবিত অন্যান্য প্রতিটা মানুষের ভেতরেই তো কাজ করবে। তারা বেঁচে থাকার যে অনুভূতির ভেতর দিয়ে যাবে, আমরাও যখন বেঁচে ছিলাম, সেই 'রকম' অনুভূতির ভেতর দিয়েই যেতাম। হয়ত তাদের সেই 'আমিত্ব বোধ' আমার বা তোমার 'আমিত্ব বোধের' মত নয়। তারা অনুভব করবে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক এবং জিনগত 'আমিত্ব বোধ'; কিন্তু অনুভব একি। আমার বা তোমার অথবা অন্যান্যদের মতই সে অনুভব। এটাই মানুষের সাথে মানুষের অন্তর্গত প্রধান মিল।

কিন্তু আমি একটা বিষয় নিয়ে দ্বিধায় আছি। আর কৌতূহলীও। জানি না ব্যাপারটা শিশুসুলভ কিনা... অনেক কিছুই তোমার সাথে শেয়ার করলাম। সুতরাং এটাও করি।

পৃথিবীতে মানুষ আসছে মোট কত বছর হল? ৬০ লক্ষ? ধরো, ৬০ লক্ষ বছর। টিকে থাকবে আরো কত লক্ষ/কোটি বছর? ধরো, আরো ৬০ লক্ষ বছর। তাহলে মানবপ্রজাতির টিকে থাকার মোট ব্যাপ্তিকাল ১২০ লক্ষ বছর। এই সময়টুকুতে বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ এসেছে, ভবিষ্যতেও আসবে। এবং, প্রতিটা

মানুষের আমার মতই 'আমিত্ব বোধ' ছিল আর থাকবে। মানুষ বিচরণের এই ব্যাপ্তিকালে আমি জন্ম নিয়েছি '৯৪ সালে, ধরো, মরে যাব '৪৪ সালে; ফলে আমার মোট ৫০ বছরের জীবনের (অন্যকথায়, আমার এই ৫০ বছরের বোধ- যাপন কালের) আগে পৃথিবীতে কি একজন মানুষও ছিল না যে আমি এখন যে আমিত্ব বোধের অনুভবের ভেতর দিয়ে যাই, সে একি বোধের ভেতর দিয়ে গিয়েছিল? অথবা, আমার মৃত্যুর পর এত হাজার হাজার কোটি মানুষ জন্ম নেবে, তাদের ভেতর একজনও কি আমার আমিত্ব অনুভব নিয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেবে না? যদি নিয়েই থাকে এবং ভবিষ্যতে যদি নেয় তবে এটাও আবার ঠিক যে, একি সময়ে একাধিক ব্যক্তি এই 'আমি'র অনুভব নিয়ে পৃথিবীতে থাকবে না। থাকলে, একক সময়ে একজনই থাকবে। যেমন, এখন আমি বেঁচে আছি; এই সময়ে আমি ছাড়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ তো নেই যে আমার হয়ে মুহূর্তগুলো অনুভব করতে পারে; কেউ নেই। যাইহোক, যদি এমন থেকেই থাকে সে নিশ্চয় আমার এই চেহারা বা এই মানসিকতা নিয়ে জন্মাবে না! হয়ত তখন আমার এই দেহ থাকবে না, এই মন- মানসিকতাও থাকবে না; আজকের দিনের কিছুই থাকবে না। তবুও হয়ত কোন ভাঙা ঘরের চৌকির উপর বসে আমার এই 'আমিত্ব বোধ' নিয়ে কোন এক নগ্ন বালক বা বালিকা বসে থাকবে। অথবা, মানুষ না হয়ে অন্য কোন প্রাণীর মাঝেও থাকতে পারি...

এই ভাবনাটা বোঝার জন্য একটা দৃশ্যকল্পের সাহায্য নেই। পৃথিবীকে একিসাথে উন্মুক্ত এবং অন্ধকার একটা মাঠ কল্পনা করা যাক।

সময়ঃ ১২ মার্চ '১৬; রাত ১০ টা।

ধরো, এই মাঠে বিভিন্ন মানুষ যে যার কাজে ব্যস্ত। আরো কল্পনা কর, এই অন্ধকার মাঠে সবাইকে ঘোলাটে দেখাচ্ছে, শুধু উজ্জ্বল বাতির মত আমিই জ্বলে আছি। এই জ্বলে থাকাটাই আমার 'আমিত্ব বোধ' নিয়ে বেঁচে থাকা। এবার, মনে কর, আমি মারা গেলাম। ফলে মাঠের যে কোণে আমি বাতি হয়ে জ্বলেছিলাম, মৃত্যুর সাথে সাথে তা নিভে গেল!

এবং,
মাঠের অন্য কোনো প্রান্ত থেকে ঘোলাটে আলোর ভেতর থেকে কেউ একজন বাতি হয়ে জ্বলে ওঠল! প্রকারান্তরে, তখন ওটা আমিই!
এই ব্যাপারটা আমি জীবিত থাকাকালে যারা বেঁচে আছে, তাদের ভেতর থেকেও হতে পারে; অথবা আমি মৃত্যুর পর নতুন কেউ জন্ম নেওয়া মানুষের ভেতরেও হতে পারে। আমার জন্মের আগেও সেই অন্ধকার মাঠে উজ্জ্বল বাতি নিয়ে কেউ

জ্বলে থেকে থাকতে পারে, যার মৃত্যুর পর আমি সেই আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলাম...

এমন হলে ভাল হবে। এমন হলে, যতদিন প্রাণের কোন অস্তিত্ব এই মহাবিশ্বে থাকবে, ততোদিন আমি ফিরে ফিরে আসব!

আমি কিন্তু হিন্দুধর্মের সেই জন্মান্তরবাদের কথা বলছি না। তবে আমার ধারণা, এই চিন্তাটা শুধু আমার মাথাতেই আসে নি; মানুষের বহু পুরোনো চিন্তা এটা। জন্মান্তরবাদ খুব সম্ভব এই চিন্তারই আদিম ফসল।

অবন্তী, আমি জানি না তোমাকে কিছু বোঝাতে পারলাম কিনা। ভাষারূপ দিতে পারলাম না বলে অনেক অনুভূতিই বাদ পড়ে গেল। অথবা, উপরে এই যে এত এত শব্দ বাক্য খরচ করলাম, বেহুদা গেল কিনা, এটাই ভাবছি। আমার অক্ষমতা ক্ষমা কর।

পুনশ্চঃ

১। জন্মটা নাকি একটা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। প্রতিটা মিলনে ভ্রুণ তৈরী হয় না, আবার যে মিলনে তা তৈরী হয় সে মিলনের সময় কোটি কোটি শুক্রানু আর কোটি কোটি ডিম্বানুর ভেতর যে কোন গ্রুপ মিলিত হয়ে ভ্রুণ তৈরী হয় সেটা পুরোটাই কাকতালীয়! হয়ত মিলনটা একটা মিলনের আগে/পরে হলেই যে জন্ম নিল, সে নাও নিতে পারত, জন্ম নিত ভিন্ন আরেকজন। সেই দুজনের মধ্যে প্রধান যে পার্থক্য হতে পারে সেটা সেই 'আমিত্ব বোধে'!

২। জাফর ইকবালের একটা সায়েন্স ফিকশন আছে, যেখানে একটা লোককে নদীর তীরে নিয়ে গুলি করে মারা হয়, এবং মৃত্যুর পর দেখতে পায় সেখানে 'আমি' বলে একক কোন অস্তিত্ব নেই। সমস্ত প্রাণের অস্তিত্ব মিলে একটা অস্তিত্ব। এবং, সে চাইলে 'যে কেউ'হয়ে যেতে পারে। মানে, যে কারোর 'আমিত্ব বোধ' লাভ করে তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। অদ্ভুত চিন্তার গল্প না?

৩। এতকাল ধরে পৃথিবীতে মানুষ, হয়ত টিকে থাকবে আরো বহুকাল, আমি কেন এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম নিলাম? প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা!

ধর্মীয় মিথে আস্থা নেই। তাই এইসবের উত্তর খোঁজার জন্য মনে মনে অনুসন্ধান চলছে। কবে মিলবে উত্তর, জানি না। অথবা আদৌ মিলবে কি? নাকি এগুলোও চিরন্তন প্রশ্নই রয়ে যাবে? কার্ল স্যাগান বলেছিলেন, অধিকাংশ মানুষ মহাবিশ্বের কিছু না জেনেই দিব্যি জীবন-যাপন করে যাচ্ছে। সত্য!

যাইহোক, কত কিছু আবিষ্কৃত হচ্ছে, উদ্ভাবিত হচ্ছে। সবটাই জীবনকে সহনীয় আর জীবন- যাপনকে আয়াস সাধ্য করার জন্য। তবুও এইসব প্রশ্ন প্রশ্নই রয়ে গেছে। একদিন মানুষ আর থাকবে না; তারা মহাবিশ্ব থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে হয়ত এইসব প্রশ্নের উত্তর না জেনেই! কারণ, এগুলোর সমাধান না জেনেই দিব্যি জীবন- যাপন করে যাওয়া যায় যে! শুধু আমার মত কিছু অকর্মাদের মন- মগজ দখল করে রাখবে এইসব প্রশ্ন!

ইতি-

সতীর্থ

১৫ মার্চ '১৬

চাকরি-বাকরি, শহুরে মানুষ এবং কৈশোরিক বান্ধবি

অবন্তী,

এখন আমি শহুরে মানুষ। এখানে বাপ- দাদার কোন তালুক নেই যে, বসে বসে দিন গুজার করব; খেটে খেতে হয়। মাথার ওপরে বস নামক দেবতাদের তুষ্ট রেখেই, এবং সকালে নির্দিষ্ট সময়ে জেগে ওঠার তাগিদ নিয়েই, ঘুমোবার আয়োজন করতে হয়। চারপাশে দেখি, সবাই কী ব্যস্ততার মাঝেই না বাড়ি ফিরে, আবার সেই একি ব্যস্ততার মধ্যে ঘরের বাহির হয়। ঘরের ভেতরে কেমন ব্যস্ততা নিয়ে রাত্রিটা পার করে তাও টুকটাক দেখি। অনুমান করি, ওরা আরো ব্যস্ততার মধ্যে রাত কাটায়! আমি শুধু দেখি, ভোরে তাদের হন্তদন্ত হয়ে বের হওয়া আর সন্ধ্যা মেলানোর পর হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢোকা— ভালো কথা, বাড়ি না বলে বাসা বললেই তাদের এই আবাসস্থলটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়। কেননা, এ- শহরে বাড়ি খুব কম সংখ্যক মানুষেরই আছে; বলতে গেলে প্রায় অধিকাংশই উদ্বাস্তু। আমি এইসব বাসার নাম দিয়েছি খোঁয়াড়! আমি এও দেখেছি, সেই খোঁয়াড়ে বসেও তারা অফিস সংক্রান্ত নানা টুকটাক কাজ করছে; এই যেমন, ফোনে 'দরকারি' কথা সেরে নেওয়া, ফাইল- পত্র নাড়া- চাড়া করা, কাজের এসাইনমেন্ট তৈরি করা ইত্যাদি। আচ্ছা, তারা অফিসটাকে বাসায় নিয়ে ঢুকে কেন? পকেটে করে কিংবা হাতে করে ঢুকে— এটা নাহয় অনেক ছাড় দিয়েও মানা গেল, কিন্তু মাথার ভেতর লুকিয়েও তারা বাসায় নিয়ে আসে! মাথা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস; তারা কেন একটা মাত্র জীবন যাপন করে, বলতে পারো? তাদের ভাব- সাব দেখে মনে হয়, তারা যাপন করে মূলত অফিস- জীবন; আর এর ফাঁক- ফোকরে, সেটা সামাজিকতার জন্যই হোক অথবা পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতার তাগিদেই হোক, যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেবার জন্যে বাবা- মার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করে, প্রতিবেশির সাথে কালে- ভদ্রে হাই হেলো। বাকি থাকে বউ আর ছেলে- মেয়ে। বউ তাদের দরকার সঙ্গমের জন্য; সেটা যেন অফিস- জীবনের ক্লান্তির ভারে নুয়ে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে একটু চিত্তবিনোদন। আর ছেলে- মেয়ে; সে তো তার অস্তিত্বেরই সম্প্রসারণ, ভবিষ্যৎ জীবনের আঁকড়ে ধরার এবং নিজের ভেতরের স্বপ্নকে

বাস্তবায়িত করার মাধ্যম মাত্র! অবন্তী, শহুরে মানুষগুলো সত্যি যান্ত্রিক হয়ে গেছে।

আমার মাথার ওপর কেউ কর্তৃত্বের ছড়ি ঘোরাক, এটা মোটেও পছন্দ করি না; আমি স্বাধীনচেতা মানুষ। এইসব শহুরেদের জীবন-যাপন পদ্ধতি আমার মোটেও পছন্দের না। আমি চাই না এমন জীবন যাপন করতে। আমার উপর বস নামক কোন এক বালেশ্বর চোখ গরম করে কথা বলবে, মাঝে মাঝে তার সেই কথা-বার্তা কান ঝাঁজিয়ে দিয়ে যাবে আর আমি অপরাধী বালকের মত মাথা নিচু করে খোঁয়াড়ে ফিরব, তারপর তা ভুলে, বেতন নিয়ে মাস্তি করে কাটাব— এই জীবন-যাপনের উপর আমি ছ্যাড়ছ্যাড় করে মুতে দেই। একদিন সত্যি সত্যি মুতে দিয়ে চলে যাব, দেখো! কী আছে শহরের চার দেয়ালের ভেতর; এর ভেতরে আটকে পড়ার সুখ—সেটা কী বস্তু? তারা চায় টাকা, সেই টাকায় কেনা হবে সুখ আর সামাজিক স্ট্যাটাস! কিন্তু তারা কী জানে, তারা মূলত ইঁদুরের জীবন-যাপন করছে? বাঙালির সাধারণ জীবন-যাপন থেকে বের হয়ে নিজেদের 'এলিট' শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তাদের যে উদ্যম আর অধ্যবসায়, তা যদি থাকত সাধারণ আর নিস্তরঙ্গ জীবন-যাপনের সাধনায়, তাহলে আমার বিশ্বাস, যে সুখের জন্য জীবনভর এত এত আয়োজন তা আর অধরা থাকত না। ধরা যাক, গ্রামের কোন এক ক্ষেপা বাউলের কথা, আমি দেখেছি তারা সুর আর গানের মাঝে এতই ডুবে থাকে যে, গোসল করতে নেমেও গলায় পেঁচানো গামছা যে ক্রমশ জলে ভিজে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই একটুও; যেন আপন সুখে মত্ত কোন এক সঙ্গমরত টিকটিকি, কখন যে লেজ খসে পড়ছে, সেদিকে নজরই নেই! তারা বাউল না হোক, অন্তত তাদের সহজিয়া দর্শন নিয়ে তো নিজেদের এই শহুরে জীবনে যাপন করতে পারে? তা না, প্রতিযোগিতার জন্য কী দৌড়! কেন অযথা জীবনকে এমন জটিল আর যান্ত্রিক করে তোলা চাই। আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করে, তারা কি আসলেই সুখি? নাকি একটা অভ্যস্ত জীবন-যাপন করে? যেখানে সুখ বাইরে চকচক করে আর ভেতরে হতাশা, ক্লান্তি, উদ্বেগ, অতৃপ্তি? যদি এইভাবেই তারা সুখি হয়, তবে তার স্বরূপটা জানতে ইচ্ছে করছে।

আমি পারব না মোটেও; ধরো, আমি এই শহরের একটা এপার্টমেন্টের মালিক হলাম, তবুও আমি সুখী হতে পারব না। সুখ তোএকটা মানসিক প্রক্রিয়া। আমি বরং স্বস্তি বোধ করি আমার গ্রামের সেই টিনের ছোট্ট ঘরটাতে, অথবা নোনা ধরা দেয়ালে— জানালার বাইরে খোলা প্রান্তর, ঘাস আর গাছ। ওখানে মানুষের প্রতিটা কথা আর অঙ্গভঙ্গি আদি এবং অকৃত্রিম। তারা সাধু নয়, তবে অধিকাংশই সরল। কুটিল শুধু কয়েকজন, তারা এইসব শহুরেদের জাতভাই। আর দ্যাখো, এখানে, এই শহরে, কেউ একটা শ্বাস নিলেও তাতে ভেবে চিন্তে নিতে হয়। নিজের ভেতরের সহজিয়া মানুষটাকে

স্ট্যাটাসগত বাঁধা টপকে বের হতে দেওয়া হয় না। আমি গাঁয়ের সহজিয়া জীবন- যাপনের সাথে মিশে যেতে চাই।

পুনশ্চঃ আজ ভোরে, অনেক ভোরে, যখন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরে চোখের পাতা সবে জোড়া লাগছে, আমি অদ্ভুত একটা স্বপ্নে তলিয়ে যাই। আমি যেখানে আছি, মিরপুরের DOHS এ, এখানকার সবকিছুই কেমন যেন গোলকধাঁধার মত লাগছে। এক গলি দিয়ে বের হয়ে যখনই হোটেলে কিছু খেয়ে বের হই, তারপর আমি আর বাসায় ফেরার পথ খুঁজে পাই না। বারবার এ- গলি ও- গলি করে শুধু কোন এক অপরিচিত বড় রাস্তায় গিয়ে ওঠি। হোটেল মালিক কিংবা চারপাশের দু একজনের সাথে কীসব আলাপ হয়, এখন ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে, আমি আবার সেই হোটেল থেকে বের হয়ে আমার বাসার ফেরার উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছি; দেখি একটা চিপা গলি। এটা বারবনিতাদের পল্লী, এখানে আসা মানা। কী মনে করে ঢুকে যাই, তারা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে আমাকে, কেউ কিছু বলছে না, এতে অবাক হই না। তাদের এলাকা ছাড়িয়ে আরো কয়েকটা গোলকধাঁধা পেরিয়ে যাই। এবার আর বড় রাস্তা নয়, নিজেকে আবিষ্কার করি কোন এক গাঁয়ের রাস্তায়। বোধহয় আপন মনে বাড়ি ফিরছি। একটা পুকুরপাড়ের সরু বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটছি, সেই সময় দেখি, আমার স্কুল জীবনের দুই বান্ধবি আমার দিকে আসছে। গায়ে স্কুল কিংবা কলেজের ইউনিফর্ম, পিঠে স্কুল- ব্যাগ। আমি দ্রুত তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না। যখন ওদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছি, তখনই দুজনের মাঝখানে স্কুল জীবনে যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিল আমার, সে চেঁচিয়ে ওঠেঃ *ইফন না ওডা?* অপর বান্ধবি মুখ ঝামটিয়ে উত্তর দেয়: *এহন কি আর কতা কব! আমগোরে চিনব!*

ধরা পড়ে গেছি; এগিয়ে যাই। এক বুক সংশয় আর লজ্জা নিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কেমন আছ?' সে সেই পরিচিত ভঙ্গিমায় হেসে জবাব দেয়, 'ভাল আছি। তুমি?' আমি কোন উত্তর দিতে পারি না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে চেষ্টা করি। সে খুব রূপসী নয়। কিন্তু মায়াঝরা সে মুখ! আমি তৃষিতের মত তাকিয়ে থাকি। দুই হাতে ওর কাঁধ জড়িয়ে ঠোঁটে আর কপালে চুমু দিয়ে বলি, 'তুমি আমার প্রেমিকা হবে?' তারপর ভাবতে থাকি, ও কি অবাক হল? খুব ভাল বান্ধবি হওয়া সত্ত্বেও যখন কোনদিন এইসব প্রস্তাব তাকে করি নি স্কুল জীবনে, আজ এতোদিন পর কেন হঠাৎ তা দিচ্ছি!

যেন ওর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, কিংবা আমার এ আবেগের কৈফিয়ত দিচ্ছি, এমন সুরেই বললামঃ তুমি আমার কিশোর বেলার মানুষ। তোমাকে কাছে পাওয়া মানে আমার হারিয়ে যাওয়া সেই এক টুকরো কৈশোরকেই কাছে

পাওয়া। তুমি প্রেমিকা হবে তো? তখন, ওর মুখে স্পষ্ট বিভ্রান্তির ছাপ ফুটে ওঠে।

ইতি—
সতীর্থ
মিরপুর, ঢাকা
১৫ ডিসেম্বর, '১৪।

কামুর নোটবুক, জীবনানন্দীয় ভূত আর উজ্জ্বল লাইটপোস্ট

অবন্তী,

আজ সকালে আলবেয়ার কামুর নোটবুক পড়তে গিয়ে বিষণ্নতা বোধ করতে থাকি। কামু নিজে ছিলেন খুব সম্ভব 'দি আউটসাইডার'-এর মার্সেল, যে উপন্যাস পড়তে গিয়ে আমরাও মার্সেলের মত জীবনের নিরর্থকতা বোধে আক্রান্ত হই। সেই নিরর্থকতা বোধ তার নোটেও গভীরভাবে সঞ্চার করে গেছেন; যদিও সেইসব দার্শনিক কথা-বার্তার সবটা যে ধরতে পেরেছি, তা নয়—যতটুকু ধরতে সক্ষম হয়েছি, বলা ভাল, যতটুকু আমাকে আক্রান্ত করেছে, ততোটুকুর বিষণ্নতা আমার চোখে কুয়াশা হয়ে নেমে এসেছে। জীবনের সমস্ত আয়োজন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার তাগিদ অনুভব করছি। আহ! যদি সত্যি তা করা যেত!

কারোর মুখে শুনেছি, মার্সেলের সেই এবসার্ডিজম আসলে একটা মানসিক রোগ, আর এই এমন এক রোগ, যা তোমাকে জীবনের উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা, উত্তেজনা ইত্যাদি উপভোগ করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। হতে পারে। কিন্তু, আমরা যারা মার্সেলের ভেতরে জীবনের নগ্ন রূপের এমন নগ্ন উপস্থাপন দেখে লেখকের কৃতিত্বে মুগ্ধ হবার বদলে বরং তাতে আক্রান্ত হই, তাদের এই আক্রান্ত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না, বিশ্বাস কর? বলতে পারো, শুধু আমাদের বেলায় কেন এমন হল? আসলে, আমাদের এই নিরর্থকতা বোধ সেই ছোটবেলা থেকেই ভেতরে গেঁথে ছিল, অথবা কারোর কারোর ভেতরে

ঘুমিয়ে ছিল— আমরা যখন মার্সেলের সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আসলে নিজেদের ভেতরের নগ্ন রূপটারই প্রতিফলন খুঁজে পাই তার ভেতরে। এবং, আক্রান্ত হয়ে পড়ি। আর যাদের ভেতরে ঘুমিয়ে ছিল এতোদিন এই বোধ, জীবনের সমস্ত আয়োজন উৎসবে অংশগ্রহণ করা শেষে, একদিন যখন মার্সেলের মুখোমুখি হয়, আর ভেতরে এতোদিন যাবৎ ঘুমিয়ে থাকা এবসার্ডিজম ধড়ফড় করে জেগে ওঠে— তাদের অনেকেই এই নিরর্থকতা বোধের আকস্মিক আক্রমণের তীব্রতা সইতে পারে না; তারা কোন এক পঞ্চমির জ্যোৎস্না রাতে চাঁদ ডুবে গেলে অদ্ভুত আঁধারে এক গাছি দড়ি হাতে অশত্থের ডালে মুক্তি খোঁজে। তারা হয়ত কৃতিত্বের সাথে স্কুল শিক্ষা-জীবন পার করে, বন্ধু-বান্ধব, চেনা-অচেনার সাথে সামাজিক পারিবারিক জীবন-যাপন করে, রূপসী মেয়ে বিয়ে করে, সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয়, সব রকমের 'সুখে' কাটানোর মত অর্থ-বিত্তের মালিক হয়, খ্যাতি আসে— তারপর কোন এক রাতে রূপসী বউয়ের সাথে সঙ্গম শেষে আনমনে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে; তখন মনের গভীরে ঘুমের ভান করে ঘাপটি মেরে থাকা সেই জীবনানন্দীয় ভূত আলগোছে সেই কড়িকাঠে ঝুলতে থাকে।

আর, তখনই তার মনে পড়ে যায়, সে যে সেই ছোটবেলা থেকে সফলতার পেছনের ছুটেছে, তার স্বরূপ কি আসলে এ-ই? সে লেখাপড়ায় ভাল করতে চেয়েছিল, বেশ কৃতিত্বের সাথেই করেছে; উঁচু বেতনের চাকরি পেতে চেয়েছিল, সে শুধু ভাল চাকরিই পায় নি, সাথে সামাজিক মর্যাদাও লাভ করেছে; খুব রূপসী একটা প্রেয়সীর দিবাস্বপ্নে সে কত দুপুর কাটিয়ে দিয়েছে, তার বউটা বলার মত সত্যি তেমন রূপসী বটে; আর তাদের পাশে এখনো শুয়ে আছে তার তারুণ্যের সেই স্বপ্নের মানিকজোড়! অথচ, আজ সব কিছু পাবার পরে মনে হচ্ছে, সে মোটেও এসব চায় নি; সে যা চেয়েছিল তা 'অন্য কোথাও, অন্য কোন জীবনে।'

২.

মানুষের জীবন-যাপনের একটা চিরন্তন প্যাটার্ন থাকে। হোমারের যুগের অডিসি যে যুদ্ধময় জীবনযাপন করে, আধুনিক কালে এসে জেমস জয়েসের ইউলিসিসও একি যুদ্ধ করে যায়; অডিসির যুদ্ধটা ঐতিহাসিক হয়ত, আর আধুনিক ইউলিসিসেরটা জীবনযুদ্ধ। ধরণটা শুধু পাল্টাইয়, অনুভুতির ইতিহাস একি। লক্ষ

বছর পরেও হয়ত তা-ই থাকবে। সব কালে সব মানুষের জীবন সেই একি অনুভব-প্রণালীতে যাপিত হয়। ধরা যাক, ষাট বছরের জীবনে একটা মানুষ যে জীবনটা যাপন করে, সেই জীবনে প্রতিটা দিন যা যা করেছে, যেসমস্ত ঘটনা এবং পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে— সেগুলোর ভেতর যা ছিল প্রথম, তা-ই হল অভিজ্ঞতা। একজন মানুষের ষাট বছরের সমস্ত জীবনে সে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি কমই হয়। বাকিটা সময় সে একটা অভ্যস্ত জীবন যাপন করে কাটায়। যেন, জাস্ট বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকা অথবা নতুন আরও অভিজ্ঞতা লাভের আশায় প্রতীক্ষা। অথবা, কেউ কেউ নিজের ভেতরে তাকায় না। ফলে সে যে কী এক শূন্য জীবন-যাপন করছে, তা আর দেখেও না। তারা আপাতত চোখে সুখি। একটা অভ্যস্ত জীবন নিয়েও সুখি। কিন্তু কেউ কেউ একটা অভ্যস্ত জীবন নিয়ে সুখি হতে পারে না, আমার মত যারা। তারা নিরন্তর নিঃসঙ্গ। তাদের সঙ্গ দেয় দিবাস্বপ্ন স্মৃতি আর চারপাশ। চারপাশের কর্মযজ্ঞে এরা অংশগ্রহণ করে না, শুধু দেখে যায়। এগুলোই তার বেঁচে থাকার অবলম্বন।

আমারও একটা অবলম্বন আছে, সেটা সাহিত্য। এযাবৎ এটাই ভেবে আসছি, কিন্তু ভেতরে কখনো তাকাই নি বলেই ফাঁকটুকু ধরতে পারিনি। ইদানীং শাহাদুজ্জামানের 'কাগজের এরোপ্লেন' সেই রফিকের মত আমারও মনে হয়,— *"সাহিত্য আমার কাছে ধন উপার্জন কিংবা খ্যাতির পরিপূরক কোন মাধ্যম নয়। এ আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় খাদ্য মাত্র। ভেবেছিলাম বেঁচে থাকার একটাই তাৎপর্য, লিখব। লেখালেখি ছাড়া পৃথিবীর বাকি যাবতীয় কাজ আমার কাছে হাস্যকর। কিন্তু ক্রমশ টের পাচ্ছি লেখালেখি আমাকে দিয়ে হবে না। সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সূক্ষ্মিক্ষম প্রজ্ঞার। সেই প্রজ্ঞার উৎসভূমি আমার কাছে নেই। আছে প্রবঞ্চনা। এ ছাড়া লিখতে পারি অন্যের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। কিন্তু তাতে কী লাভ? যার ভালো লাগার আমি না লিখলেও পড়বে। বাকি রইলো সাহিত্যপাঠ। এ যাবতকাল বেশ কিছু পরিমাণ সাহিত্য পড়ে মনে হয়েছে, না পড়লেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। অতএব বুঝতে পারছি আমার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, হয় এবং হবে।"*

তারপরও আমি এখন আর নৈরাশ্যবাদ পছন্দ করতে চাই না। জাস্ট ভুলে থাকতে চাই। নাহয় একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির মিথ্যা বিশ্বাসের মত একটা মিথ্যে জীবনই কাটালাম, এত সত্য জেনে কী হয়? নৈরাশ্যবাদের ভেতরে বাস করতে করতে জীবনের প্রতি ঘেন্না ধরে গেছে। আমি জীবনকে ভাল বাসতে

চাই। আবার, বাবা বা চারপাশের মানুষগুলো যে একটা অভ্যস্ত জীবন-যাপন করে যাচ্ছে, সে জীবন যাপন করাও অসম্ভব; তাতে আমি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে। তাই ভালবাসি, যারা Explorer, তাদের; জীবনের ক্ষেত্রে। যারা এই অভ্যস্ত আর রুটিন মাফিক সামাজিক জীবনের ভেতর থেকে বের হয়ে জীবনের প্রতিটা মোড়ে মোড়ে নতুন নতুন লাইটপোস্ট আবিষ্কার করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অভ্যস্ত আর শান্ত জীবনের 'কমফোর্ট জোন' থেকে বের হতে সাহস পায় না, তারা সেই সাহস করে বলেই জীবন যে একটা অন্যের যাপিত জীবনের খোসা নয়, বরং পরিপক্ক ফল, তার স্বাদ পায়।

অবন্তী, ভাবছি, এখন ভেতরে না তাকিয়ে, দৃষ্টি সর্বদা পথের দিকে আর চারপাশে নিবদ্ধ রাখব। জীবনের মোড়ে মোড়ে খুঁজে বেড়াব শুধুই উজ্জ্বল লাইটপোস্ট। সফল হতে পারব কিনা, জানি না— কিন্তু, এতে যদি অন্তত মার্সেলকে ভুলে থাকতে পারি।

পুনশ্চঃ

আমরা যারা আত্মহত্যাপ্রবণ, জীবন নামক দুঃসহ বোধের হাত থেকে মুক্তি পেতে মৃত্যুর কাছে গিয়ে মুক্তি খুঁজি, তাদের কাছে 'জন্মদিন' নামে উৎসবটার হয়ত কোনো অর্থ বহন করে না। তা না করুক, তবুও আজকে যার জন্মদিন উপলক্ষে এই লেখা, তাকে কিছু কথা জানাতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে হয় বলি, এই শুনো, জন্ম নেওয়াটাই একটা আশ্চর্য ঘটনা। ২১ বছর আগে আজকের এই দিনে তোমার জন্ম না হলে, জীবন নামক এক আশ্চর্য বোধের সন্ধানই পেতে না! নিজেকে জানো না তুমি, কিন্তু আমি জানি, তুমি এক আশ্চর্য মেয়ে, তোমার চিন্তার গভীরতা আমাকে বরাবর মুগ্ধ করে, তোমার ভাবনাগুলো আমার ভেতরে নতুন বোধের জন্ম দেয়। আপনা থেকেই শ্রদ্ধা চলে আসে আমার। আর একধরণের সুক্ষ্ম গর্ব বোধ করি এই ভেবে, আমরা একসাথে আছি। ইচ্ছে করে আরো বলি, এমন জনম ভবে আর হবে না, সুতরাং কৃতজ্ঞ থাকো এই জন্মদিনটির প্রতি।

তুমি তো জানো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বন্দীরা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে চরম

নিগৃহীত হবার পরেও তারা আশা করে যেত একদিন এই দিনের অবসান ঘটবে। জীবনে আবার শান্তি আর স্থিতি ফিরে আসবে তাদের। আনা ফ্রাঙ্কের কথা মনে পড়ে তোমার? সবে কিশোরী বেলায় পা দেওয়া মেয়েটা, যার কথা ছিল স্কুল আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে হোই-হুল্লোড়ের জীবন কাটানোর, সে কিনা অনাত্মীয় এক পরিবেশে বন্দী হয়ে রইল দুই বছর। তাও কী আশ্চর্য! সব প্রতিকূলতার অবসান ঘটে একদিন সুস্থির ভোর আসবে বলে সে স্বপ্ন দেখে যেত।

জীবনের প্রতি তোমার মত আমারো এত এত অভিযোগ সত্ত্বেও, আজকাল বেঁচে থাকাটাকে আর খারাপ লাগে না। আজকাল মনে হয়, এই মহাবিশ্বের তুলনায় তুমি আমি সে অথবা তারা আমরা হয়ত কিছুই না। কিন্তু আমরা ব্যক্তিগতভাবে একেকজনই একেকটা মহাবিশ্বের মত বিশাল বোধ নিয়ে বাঁচি। প্রতি মুহূর্তে সেই বোধ আমাদের চালিত করে। ২১ বছর ধরে যে বোধ বয়ে বেড়াচ্ছ, তা যতই যন্ত্রণাময় হোক, সেই বোধটা তুমি পেয়েছিলে আজকের এই দিনে। আমি কামনা করি, তোমার এই বোধ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত হোক, তুমি দীর্ঘ জীবন পাও অথবা না পাও, একটা বিস্তৃত জীবন যেন পাও। ধরো, একজন মানুষের সংগীত, চিত্রকলা, সিনেমা, বই- এইসবে সমান আকর্ষণ, তার জীবন তবে বিস্তৃত। কোন দিকে তোমার আগ্রহ জানি না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আকর্ষণ জন্মিয়ে গড়ে তোলো বিস্তৃত বোধের জীবন। যে বোধ জীবনের দুঃসহ ভার যেন ভুলিয়ে রাখতে পারে। তারপর জীবনের সমস্ত ভাড়ার শূন্য করে একদিন চলে যেও।

ইতি—

সতীর্থ

মিরপুর, ঢাকা

২৪ ফেব্রুয়ারি, ’১৫

পেন্সিলে আঁকা স্কেচের স্বীকারোক্তি

অবন্তী,

তোমাকে একটা চিঠি লিখছি। এটা কততম চিঠি? জানিনা। তবে, হয়ত এটাই শেষ। অথবা, মন ভাল থাকলে আরো লিখতে পারি।

আমার একবার মরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ঠিক ফিজিক্যালি মরে যাওয়া নয়, আর আত্মিকভাবে তো জীবনে বহুবার মরেছি, ওটাও না; আমার মরে যাবার বোধ জন্মেছিল। বোধটা এমন: বিশ্বাস করছি, আমি নিশ্চিত কিছুক্ষণ পর মারা যাব, বড়জোর আর মাত্র দুই থেকে তিন ঘণ্টা। ঘটনাটা ঘটেছিল রাত্রে, তাই ভেবেছিলাম, আগামিকালের ভোর আমার আর দেখা হবে না। কারণ ক্রমশ আমার হার্টের গতি বাড়তেই ছিল, আর ভাবলাম, এভাবে যদি বাড়তেই থাকে তাহলে একসময় হার্ট স্টপ হয়ে যাবে। পরে জেনেছি, আমি মরতাম না আসলে। কিন্তু মরি আর না মরি, বিশ্বাস তো জন্মে গিয়েছিল যে আমি মরছিই; তাই প্রকৃতভাবে মরে যাবার অনুভূতিই হয়েছিল।

এক সময় খুব ডিপ্রেশনে ভুগতাম, আর সেটা জানত শুধু আমার এক বন্ধু। সে আমাকে একটা ছোট্ট নীল বড়ি দিল, দিয়ে বলল যে, ঘুমের আগে খেতে। খাবার বেশ কিছুক্ষণ পর মনে হতে থাকে আমি আর আমার রুমে নেই, মাথার উপরের ফ্যানটার পাখাগুলো যেন সমস্ত ছাদ জুড়ে আছে। জানালা খোলা ছিল, প্রবল ইচ্ছে করছিল দেই এক লাফ। কেন যেন বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, আমি লাফ দিলে নিচে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ব না, বরং পাখিদের মত উড়তে পারব। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি জানালায় কাচ দেওয়া আর পরে যখন নর্মাল হয়েছিলাম, তখন সেই কাচের দিকে তাকিয়ে বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলাম, কেননা, এই কাচটাই তো বাঁচিয়েছিল। আমি খানিক পরে অকারণেই ভয় পেতে থাকি, ভয় তো নই জন্মের ভয় যেন, আর ভয় বাড়ার

সমানুপাতে বাড়তে থাকে আমার হার্টবিট। তারপর স্থির বিশ্বাস জন্মে, আমি তাহলে মারা যাচ্ছি। আমি আরো ভয় পেয়ে দরজা খুলে যে বাসায় লজিং থাকতাম, তাদের রুমের দরজায় পাগলের মত নক করতে থাকি, চিৎকার করে বলি: আঙ্কেল আমি মারা যাচ্ছি, প্লিজ আমাকে বাঁচান; আঙ্কেল আমার থেকেও যেন ভীষণ ভয় পেয়ে দরজা খুলে, আর আমি তাকে জড়িয়ে ধরি। বলতে লজ্জা পাচ্ছি, তবুও বলি, যেহেতু তুমি আমাকে চিনো না, তাই বলতে দ্বিধা নেই, উনি ভেবেছিলেন, রেইপ! উনি দ্রুত আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করান... এই ঘটনাটা যতবার মনে পড়ে, বিশ্বাস করবে না, আমার কী যে লজ্জা লাগে! ইচ্ছে করে স্মৃতি থেকে এই মেমোরিটা মুছিয়ে ফেলি; ইশ, যদি পারতাম!

আমার তখন কিছু কাজ করে যাবার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু অবাক হয়ে খেয়াল করেছি, আমার এই মুহূর্তটায় সেইসব কাজ যে করে যেতে পারি নি, এর জন্য আফসোস হচ্ছিল না। বরং, আমি যে হঠাৎ করে কোন প্রকার মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই মারা যাচ্ছি, এই চিন্তাটাই ভীষণভাবে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

আচ্ছা, একটা মানুষ কখন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে? মরে গেলে? তাই তো দেখি। মরে যাবার পরেও অবশ্য তার একটা ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স থাকে, কিন্তু সে তো সবসময়ই থাকে। তার দেহের কোন ইলেক্ট্রন প্রোটন নিউটন তো আর একেবারে কখনই নাই হয়ে যায় না, শুধু একদা সজীব কোষগুলো মরে যায় আর একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হয়ত আমার ঠোঁটের কোন এক পরমাণু হাজার বছর পর শোভা পাবে কোন এক হরিণের লেজের ডগায়। কিন্তু একটা মানুষ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে মৃত্যুর সাথে সাথেই, তাই না? এই দেখ, আমাকে বাবা মা কত ভালবাসে অথবা ঘৃণা করে, কাছে বসিয়ে খাওয়ায়, ছোটবেলায় আমি ভয় পেলে তাদের বিছানায় নিয়ে রাখত, এখনো বেড়াতে নিয়ে যায় এবং, আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ঠিক মরে যাবার পরেই কিন্তু আমাকে একটা রাত তাদের বিছানায় রাখবে না, তারা ধরে নেয় আমার আর কোন অস্তিত্ব নেই। আমি কত ঠুনকো একটা অস্তিত্ব তাদের কাছে! কেননা, মৃত্যু তো যেকোন সময়ই হতে পারে। আর সাথে সাথে তাদের কাছে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ব! তাহলে তারা আসলে আমার কোন জিনিসটা ভালবাসে? শরীর নিশ্চয় না, কেননা, মরার পরেও তো আস্ত শরীরটাই পড়ে থাকে। তারা ভালবাসে এমন এক অনস্তিত্ব অস্তিত্বকে, যাকে আত্মা বলে থাকি, যেটা আসলে মায়া বিভ্রম ছাড়া বেশি কিছু নয় বলেই বিশ্বাস করি।

অবন্তী, আমাকে যখন কল্পনা করবে, তখন আমার শারীরিক অস্তিত্ব কল্পনা করবে না। প্রজাপতি বোধহয় তোমার খুব প্রিয়; তার যে সুন্দর একটা শেইপ আছে, শারীরিক কাঠামো যাকে বলে, সেটা না— ধর, শুধু রঙটুকু, আমাকে সেই রঙ টুকু কল্পনা কর। অথবা, আমাকে কল্পনা কর শিল্পীর পেন্সিলে আঁকা কোন স্কেচ, যার সমস্ত অনুভূতি আছে, কেবল তাতে নেই কোনো রক্ত মাংস। আমাকে ভাবতে পার, অস্তিত্বহীন অস্তিত্ব।

ইতি—

সতীর্থ

২০১৪

শহুরে ইটের গায়ে লেগে থাকা তুমি

অবন্তী,

আমার শৈশবে পুকুরের জলে আকাশ নামত। নীল আকাশ; পুকুরের ওপরে অনেক উঁচুতে আমাদের আর আশপাশের অন্যদের গ্রামের মাথার ওপর ছাতার মত ঢেকে রাখত যে আকাশ, তার এক টুকরো শরীর সেই পুকুরে ঘাপটি মেরে থাকত। আমি জানতাম, ওই যে জলের মত টলমলে করছে যে স্তর তা সেই আকাশকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে কেবল। এখন, এই সন্ধ্যায় যদি চোখ বন্ধ করে একটা লাফ দেই, আমি নিশ্চিত ওই নীলের মাঝে টুপ করে ডুবে যাব। যতই গভীরে যাব ততোই নীল; নীল আর নীল— মেঘের গাঁ ছুঁয়ে ছুঁয়ে, তার হিম পরশ শরীরে মেখে পৌঁছে যাব নীলকুঠিতে। এক সকালে যখন নিত্যকার মত পুকুরের পাড়ে বসে বসে সেই ছোট্ট আকাশটাকে দেখছি, তখন হঠাৎ মনে হল, নাহ! নীলের মাঝে হারিয়ে যাবার কোনোই মানে হয় না, বরং মেঘের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর থেকে আরো দূরে ঘুরে বেড়ালে কেমন হয়!

সে বয়সটা আর নেই। এখনো আকাশ বুকে নিয়ে চুপচাপ ঝিম মেরে আছে পুকুরটি, শুধু আমি আর সকাল বিকাল সন্ধ্যায় তার পাড়ে গিয়ে বসি না। রাত হলে ছাদে বসে শহুরে আকাশ দেখি। কিন্তু সেই আকাশে উড়ে যাবার পাখনা খুঁজে পাই না। বোধকরি, আমি শৈশবেই পুকুরের পাড়ে সেই পাখনা হারিয়ে ফেলেছি, তারপর কোন এক অশুভ সকালে শহরের পথে পা বাড়িয়েছিলাম। জানি, আমি আর খুঁজে পাব না তাকে। হয়ত সেটা কুড়িয়ে নিয়েছে কোন এক স্বপ্নাতুর গ্রাম্য বালক/বালিকা, ঠিক আমি যেমন নিয়েছিলাম আমার আগ্রজ কোন শহুরে কিশোর/কিশোরীর; তারাও হয়ত আমার মত একদিন পাখনাটি অবহেলায় ফেলে এসেছিল পুকুরের পাড়ে।

তারপর তারা একদিন শহরে চলে আসে, আমার মত করে। পেছনে ফেলে আসে আকাশ ভরা পুকুর, নিবিড় জঙ্গলের ভূতে ভরা বাঁশঝাড়, সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা শালিকের যন্ত্রণাদায়ক চেঁচামেচি, জোছনা রাতে ধবধবে ওঠোনে নুয়ে পড়া নারকোল গাছের ছায়া, মায়াবী স্নেহাকুল মুখগুলো, আর ঝিঁঝিঁ পোকার কানফাটানো অবিরাম শব্দ।

শহরে এসে তারা তাদের হারিয়ে পায় চার দেয়ালের একটা রুম। তাদে বিভিন্ন ফটোগ্রাফ টাঙ্গানোঃ পুকুরের ওপর নুয়ে আসা তালগাছ, নীল গোলাকার বিস্তৃত আকাশের নিচে ধানক্ষেতের দিগন্তে মিশে যাওয়া সবুজ রেখা, মাথায় হাঁড়ি টাঙ্গানো খেঁজুরগাছ। এইভাবে এক সময়ের তার জীবন্ত স্বপ্নগুলো মৃত ফটোগ্রাফে ঠাঁই পেতে থাকে। মরে যাওয়া প্রাণীকে যেভাবে দেওয়ালে স্টাফ করে রাখা হয়।

একসময় তারা এই ঝঞ্ঝাট ভরা বিদেশি শহরে বড় হয়ে ওঠে, মানিয়ে নিতে থাকে চারপাশের সাথে। বিয়ে, পরিবার, নতুন জীবন—এইসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তবুও, তারা হয়ত সারাজীবন মনের খুব কোমল এক খোপে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে রাখে তাদের শৈশবের তালপুকুর, উঠোনের নারকেল গাছের ছায়া, ঝিঁঝিঁর ডাক, সন্ধ্যার পাখিদের কিচিরমিচির আর হারিয়ে যাওয়া সেইসব মায়াবী মুখ।

২.

অবন্তী, ধরি, তুমি এখন তোমার রুমে বসে আছ । তোমার রুমঃ চারটি দেয়াল, দেয়ালের গায়ে কিছু ঝকঝকে ফটোগ্রাফ আর কিছু পেইন্টিং। দরজার বিপরীতে যে দেয়াল, তার একপাশে কাঁচের ছোট্ট দরজা; সে দেয়ালের ওপাশে লাগোয়া বেলকনি, সেই বেলকনিতে যেতে হলে ছোট্ট দরজাটা গলে যেতে হয়। বিছানার পাশে যে ইজিচেয়ার, তাতে তুমি এখন বসে আছ । একটু আগে এই বিছানাতেই শুয়ে ছিলে; তোমার শরীরের ভাঁজ অঙ্কিত হয়ে আছে সেই হলুদ কমলা ফুলের বেডশিটের গায়ে, বালিশের উপর মাথার ভাঁজ।

আচ্ছা, আর পঞ্চাশ বছর পর এই রুমে কে থাকবে? তুমি নিশ্চয় নও। যদি তখনো এই রুম টিকে থাকে, তবে তুমি থাকবে; ঠিক তুমি নও, তোমার আত্মা। তোমার প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্ব এই রুমের প্রতিটা কোণায় সঞ্চিত হয়ে

থাকছে। রবীন্দ্রনাথের *ক্ষুধিত পাষাণ* গল্পের মত বহুকাল আগেকার তুমি-তোমার দেয়ালের পাষানে নিজের অস্তিত্বের স্টাফ করে যাচ্ছ।

পঞ্চাশ বছর পর যদি কেউ তোমার খুঁজে এরুমে আসে, তবে তাকে একটা দিন আর একটা রাত কাটাতে হবে। সে দেখবে তোমার হাসি, তোমার কান্না, তোমার দীর্ঘশ্বাস, তোমার কাটানো প্রতিটা মূহূর্ত এ রুমের দেয়ালে, মেঝেতে, ছাদে ফসিল হয়ে আছে। তাকে খুব যত্নের সাথে সেইসব মুহূর্তগুলো আলাদা করতে হবে।

কিংবা, এখন থেকে বহুকাল পর যখন এই রুমের কোন কাঠামোগত অস্তিত্ব থাকবে না পৃথিবীতে, তখনও এ রুমের কোন একটা ইট যদি অবহেলায় এক ঝোঁপের আড়ালে পড়ে থাকে, তাতেও মিশে থাকবে তোমার অস্তিত্ব। কল্পনা করো, কোন এক শিল্পী ভাবুক সেই ইটখন্ডটি পকেটে পুরে তার সাথে নিয়ে যাবে। তারপর গভীর কৌতূহলী চোখে সে কল্পনা করতে চেষ্টা করবে সেটার ইতিহাস। আর তাতে সে খুঁজে পাবে তোমাকে।

সে কল্পনা করে নিবে, বহুকাল আগে পৃথিবীর কোন অতি সংকীর্ণ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা এক এপার্টমেন্টের একটা রুম, সে রুমের কোন এক প্রান্তে মিশে আছে ইটখন্ডটি; আর দেখবে, সে ইটের গা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে একটা মেয়ের ছায়া- মত কিছু জীবন্ত স্কেচ, তোমার জীবিন্ত স্কেচ। তোমার হাসির সশব্দ ঢেউ খেলানো রেখা, তোমার দীর্ঘশ্বাসগুলোর ছোপ ছোপ রং, আর দেখবে তোমার কিছু স্বপ্নের উত্তেজিত ঝাঁকবাঁধা ঘন নিঃশ্বাস এবং সাথে, দুঃস্বপ্নের ধূসর তেলচিটে ব্রাশে ছোট স্পোকে আঁকা শান্ত সজীব মুখ।

আর্টিস্টটি আরেকটু বেশি কল্পনাপ্রবণ হলে এইসব টুকরো টুকরো দৃশ্যাবলি আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভবের ফসিলের আড়ালের মুখ আর অবয়বও খুঁজে নেবে। তখন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠবে হয়তো কোন এক শীতের পড়ন্ত বিকেল। দেখবে, সেই বিকেলে একটা মেয়ে স্থির চোখে দূরের কোন এক বাড়ির চুড়োয় তাকিয়ে আছে। যদি আর্টিস্টটি কান পেতে রয়, তবে পরিষ্কার বুঝতে পারবে, সেই মেয়েটি হয়ত ভাবছে, আর কতদিন তার এই অস্তিত্বের অসহনীয় ভার বইতে হবে! তারপর চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসবে, আর্টিস্টটি দেখবে কোনো অতীতের সুখকর স্মৃতির কথা মনে পড়ায় আনমনে মেয়েটি হাসছে। আর্টিস্টটি আরো দেখবে, তাকে কেউ বুঝতে না-পারার ব্যথায় সে

কাঁদছে, সে দেখবে তবুও অসংখ্য দুঃস্বপ্ন শেষে মেয়েটি অবশেষে বিকেলের নরম আলো মিলিয়ে যারার সাথে সাথে দূর দিগন্ত থেকে চোখ সরিয়ে নিজেকে দেখছে— এখন কোন এক নতুন স্বপ্নে তার মুখ আশ্চর্য ঝলমলে!

কিন্তু ভাবুক আর্টিস্টটি দেখবে না— মেয়েটি এর বাইরেও ভিন্ন ভিন্ন জীবন যাপনও করত। তার বাবা মার সাথে, বন্ধু-বান্ধবের সাথে, আত্মীয়দের সাথে; চেনাদের সাথে, অচেনাদের সাথে— তবুও শিল্পীটির আসলে সত্যিকারের অবন্তীকে চিনে নিতে তেমন কষ্ট হবে না। কেননা, সেই রুমেই, একান্ত অবন্তীর ভেতরের অবন্তীটুকুর ইতিহাস গাঁথা হয়ে থাকবে তার রুমের প্রতিটা কোণে।

ইতি-

সতীর্থ

মিরপুর, ঢাকা

২০১৪

নাকবিতা

সোলাইমানের সাপ ও গোধূলি সন্ধ্যির নৃত্য

সবুজ পটভূমিকায় লাল-নীল-হলুদ বাহারি ফুলের বেড-শিট, তার উপর স্থির হয়ে আছে বইয়ের ছায়া— বাইরে সন্ধ্যাটা বুঝি ঝেঁকে বসেছে! বসুক! কিন্তু যে গল্পটা এইমাত্র পড়ে শেষ করলাম, সে গল্পের কথক– লম্বু সোলাইমানকে নিয়ে ধন্দে পড়ে যাই। ও যখন কুয়োর ভেতর বন্দি হয়ে পড়েছিল, কী না করেছে সেই সাপটা তার জন্য? গ্রেট ম্যাসিজের সেই একেবারে নির্জন পার্বত্য এলাকায় শিকার করতে গিয়েছিল সে আর তার চোখ কিনা আটকে ছিল ধ্যামড়া এক ধুসর শেয়ালের গায়ে— পড়ুক, দৌড়ানোর সময় তার মনে ছিল না সামনে গর্ত থাকতে পারে? যে সরু কুয়োয় পড়ে গেল, যা গভীর আর ভেতরে যা ঠান্ডা— যদি সাপটা বাইরে গিয়ে খরগোশ আর তিতির পাখি শিকার করে তাকে না খাওয়াত, দুই দিনেই তো মরে ভূত হয়ে যেত!

মাথার বেশ উপরে কুয়োর সরু মাথার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল এক চিলতে নীল আকাশ। আর সে আকাশ ওকে মনে করিয়ে দেয়, এই পিচ্ছিল ঠান্ডা কুয়োর তলায় অসহায় হয়ে মরে পড়ে থাকতে হবে তাকে। সেই আবছা অন্ধকারে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবচেয়ে ছোটো মেয়েটার মুখ; দেখতেই পারত না ও মেয়েটাকে। ফেলে আসা গাঁ, সেই গাঁয়ের উজ্জ্বল দিনের আলো, আর তিন ছেলে-মেয়ে যে প্রতি রাত্রে তার চারপাশে গোল হয়ে চোখ বড় বড় করে কিচ্ছা শুনত— এইসব দৃশ্য তার গায়ে কাঁটা ফুটিয়ে দিচ্ছিল। বড্ডো অসহায় লাগছিল তার নিজেকে। তৃতীয় দিনে পাথরের দেয়াল ধরে পাগলের মত ওর লাফানো দেখে সাপটি আগে নিজে উপরে উঠে তারপর গাছের সাথে গলা পেঁচায় আর লেজ নাড়তে থাকে যাতে লম্বু সোলাইমান লেজটি শক্ত করে ধরে রাখে। অথচ প্রথম যেবার সাপটিকে কুয়োতে দেখে যে, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর

দিকে তাকিয়ে আছে, কী ভয়টাই না পেয়েছিল এই লম্বু সোলাইমান। আর কী সুন্দর, সাপ এগিয়ে এসে তার কোলে মাথা রাখল তারপর সারা শরীর পেঁচিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল— এক ঘুমেই রাত্রি পার!

ঐ মরণ গর্ত থেকে বের হয়ে যখন চারপাশে চোখ মেলে তাকাল, দিনের আলোয় কোনো কিছুই দেখে ভালো মতো বুঝে ওঠতে পারছিল না; সে পরের পুরো এক বছর গ্রামের যাকেই সামনে পেয়েছে, হাত ধরে বলেছে, 'এই যে মিয়া ভাই, একটা গল্প শুনেন! ঐ যে আমি এক শেয়ালরে গুলি করতে গিয়া গর্তে পইরা গেছিলাম না? পরেই তো আমি অবাক! আরে— একি কান্ড! ওখানে ঘুটঘুটা অন্ধকারে দেখি— এক ফেরেশতা! সাপের মুর্তি ধইরা শুয়া রইছে আর ঐ শেয়ালডা নিশ্চয় কোনো বদ জীন আছিল— ভাগ্যিস কুয়ায় পইড়া গেছিলাম...' ওরা জানে, এই গল্প তাকে শুনিয়েই ছাড়বে। তাই বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ফেরেশতা দেখতে কী রহম?'

সে গল্প শেষ করে। গল্প যখন শেষের পথে, গর্তের বাইরে আসা থেকে শুরু করে বাড়ি ফেরার সময়কার সেই মুহূর্তটার কথা মনে পড়ে যায় তার। গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে আসে, আর শ্রোতার মাথার উপর দিয়ে দৃষ্টিকে ছুড়ে দেয় সামনের গীর্জার লাল গম্বুজের উপর; শূন্য দৃষ্টি হারিয়ে যায় এক বছর আগের সেই মুহূর্তটায়— চোখের সামনে দেখতে পায় পরিচিত সূর্যের আলোয় সেই পরিচিত মাঠ। পৃথিবীর এই আলো বউ-বাচ্চা আর বাড়ির ছোট্ট উঠানের দিকে তাকে প্রবলভাবে ঠেলতে থাকে। আর বাড়ি ফেরার পথে যে ঝর্ণা নজরে আসে, তার জলে পা ডুবিয়ে ভাবতে থাকে, জীবনটা আসলেই সুন্দর! দূরে, তাদের গাঁয়ের মাথায় ধুঁয়োর কুন্ডলি উড়ছে। যেতে যেতে ঘরের সবুজ দেয়ালের রঙে চোখ আঁটকে যায় আর ঠিক তখনই বউয়ের ভেজা চুলের গন্ধ পেয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সশব্দে বাড়তে থাকে সোলাইমানের। দয়ালু বন্ধু সাপকে বিদায় জানায় সে হাত নেড়ে, এদিকে বউ-বাচ্চাদের আনন্দের চিৎকার-চেচামেচি, কুকুরের ঘেউঘেউ— এইসব হট্টোগোলে গ্রামের সন্ধ্যা কিশোরী নর্তকীর মত নাচতে থাকে। যতদিন পর্যন্ত না সাপটাকে সে কয়েকজন ধান্দাবাজ দরবেশের কাছে ১৫ তুমানে বিক্রি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সে গর্তটিকে চিনিয়ে দিয়ে আসে, ততদিন পর্যন্ত এই আবছা আলোর সন্ধ্যাটা তার কাছে এক টুকরো স্বপ্নের মতোই ছিল।

কিন্তু আমার ঘরের বাইরে যে সন্ধ্যাটা ঘনিয়ে আসছে, তা আমাকে ঘিরে নাচবে তো দূরের কথা, ঝিম মেরে বসে আছে। বইটা টেবিলে আলতো করে রেখে এক চক্কর বাইরে ঘুরে আসব কিনা স্থির করে ওঠতে পারছি না। বইয়ের কভারটা বেশ সুন্দর! একটা সন্ধ্যা-ঘেরা মালভূমি, তার উপর বসে বসে এক গাছের নিচে যে ছেলে গল্প শোনাচ্ছে আরো তিন জনকে আর একটু দূরেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যে গীর্জা— তাদের সবাইকে বইটির প্রচ্ছদ শিল্পী গাঢ় নীল রঙের সান্ধ্য-পোশাক পরিয়ে দিয়েছে। পাশে ডুবন্ত বড় এক সূর্যের উপর লাল অক্ষরে লেখা— আরমানী ছোটগল্প-সংগ্রহ। বিরাট ডুবন্ত হালকা ছাই রঙের সূর্য, হালকা ধুসর আকাশ আর তার নিচে নীল সন্ধ্যা— আমিও যেন হেঁটে বেড়াচ্ছি সেই মালভূমির উপর দিয়ে! যেখানে সন্ধ্যা নীল সুয়েটার পরে নামে, সেখানকার সান্ধ্য-ঘাস কেমন হতে পারে এই নিয়ে ভাবনায় পড়ে যাই। আমার ছেলেবেলার এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেলো— কিন্তু সেই সন্ধ্যায় বড় আপা ছিল, পড়শি ছিল কয়েকজন আর ছিল অবন্তী। বহুদিন আগে ঘটে যাওয়া পৃথিবীতে সেই সন্ধ্যাটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে আলাদা করে তারপর মালভূমির এই অপার্থিব নীল সন্ধ্যায় যদি ছেড়ে দেই, তবে প্রথমেই আমি অবন্তীর কানের কাছে মুখ এনে কয়েকটা কথা বলব। মাঠের উপর ওরা নাহয় চড়ুইভাতি খেলুক, আমি আর ও চুপি চুপি ছুটে যেতাম গীর্জার দিকে। এইবার আর কোনো ভয় আশংকা ছাড়াই সোজা ডুকে পড়তাম গীর্জায়। আমাদের গাঁয়ের মৌলবির মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে না নিশ্চয়; গিয়ে এবার আর কানে কানে না— সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে বলব, 'ফাদার, আমরা বিয়ে করতে চাই।' মৌলভি সংক্রান্ত ঘটনার সময় আমরা নাহয় পিচ্চি ছিলাম তাই মৌলভি হাসতে হাসতে ভেঙে পড়েছিলেন আর বলেছিলেন, 'ইমনের মা, হুনো তোমার পিচ্চি পোলায় কী কয়!' কিন্তু মালভূমির এই অপার্থিব নীল সন্ধ্যায় আমরা আর পিচ্চি নই। অবন্তী বেঁচে থাকলে এখন ওর বয়স হত সতের, আমার থেকে ও দুই বছরের ছোট ছিল।

গীর্জা থেকে বিয়ে করে ওদের দিকে যখন হাঁটা দিতাম, আমরা পরস্পরের দিকে তাকাতে লজ্জা পেতাম; ওর মুখে কমলা রং ছড়িয়ে পড়ত, নীল সন্ধ্যার আড়ালে দ্রুত কয়েকটা চুমো দিলে সে রং আরো গাঢ় হত। তখন সে রং থেকে কমলার সুবাস ছড়াত তারপর সে সুবাস ছড়িয়ে পড়ত তার সারা শরীরে। ওদের কাছে পৌঁছানোর আগেই ওর চিবুকে হাত ছুঁয়ে এক কৌটা গন্ধ চাইতাম। ও হেসে বলত, 'আজ সারা রাত তোমার গায়ে গন্ধ বিলোব!' আম্মার আঁচলের

খুঁটের মত নির্ভয় চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে ও। সে এক অপার্থিব নীল সন্ধ্যা— পার্থিব কোনো ভাষায় কি আর তার বর্ণনা দেওয়া যায়?

বড্ডো ক্লান্ত লাগছিল, মনটা আরো খারাপ হয়ে গেলো। কোথায় সে অপার্থিব নীল সন্ধ্যায় অবন্তী, কোথায় সে চড়ুইভাতি! মাথার উপর হালকা ছাই রঙের ডুবন্ত সূর্য কিংবা হালকা ধুসর আকাশের বদলে মাথার উপর ফুলতোলা কাগজের সিলিং; বাইরে যে সন্ধ্যা ঝুলে আছে তাও বুড়ি বেশ্যার স্তনবৃন্তের মতো কালচে আর মৃত! সেই তিন বছর আগে, 'এক সহস্র ও এক রাত্রি' বইটি অবন্তী যেদিন আমার হাতে রেখে কানে কানে বলে যে, সে নাকি আমার জন্যই পাঠাগার থেকে চুরি করেছে, সেদিন আমিও ঠিক ঠিক ঠাহর করতে পারছিলাম না, একদিন ও না থাকলেও এই বইয়ের প্রতিটা গাঁথার গা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে একেকটা অপার্থিব নীল সন্ধ্যা। বাগদাদ হয়ে ওঠবে আমার পাশের গাঁ! শাহজাদির বলা গল্পগুলো আমাদের প্রতি সন্ধ্যার মুখোমুখি মুহূর্তগুলো মনে করিয়ে দেবে!

একটু আগে, সোলাইমানের গল্পে ডুব দেবার ঠিক আগপর্যন্ত, সমস্ত মানুষের প্রতি যে অবিশ্বাস এই রুমের প্রতিটা কোণে কোণে ঝুলে ছিল, হঠাৎ যেন দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আবার ফিরে এলো আমার কাছে। পৃথিবীর কারোর সাথেই আর কোনো সম্পর্ক রাখার ইচ্ছে নাই। যেখানে আমার আপন বোন আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেখানে আর কাকে বিশ্বাস করব? তৃষার প্রতি তো আলাদা ভালবাসা ছিল, বিশ্বাসও করতাম— তবুও কেন বালিশের পাশ থেকে কারুকাজ করা আরব্য রজনীর সুখকর কারাগারের মত সেই ইমারতের কিতাবখানা সে চুরি করবে? ওকে কি বলি নাই যে, এই বই তো ছাপায় কয়েক দিস্তা কাগজে মোড়ানো একটা বান্ডিল না, এ-ছিল আমার বন্ধু— যে বন্ধু, যখন আমার চোখের দিকে নরম করে তাকিয়ে কেউ একটা মিষ্টি কথা পর্যন্ত বলে নি তখনকার অসহনীয় মুহূর্তগুলোর কর্কশ চাহনি থেকে আমাকে আড়াল করে রেখেছিল! অথচ কী হাস্যকর! যে মেয়ে তিনবছর ধরে ঠোঁটের কোণে জিভে সরিয়ে, চোখ পিটপিট করে আমাদের গল্প শোনে যেত, তাকে বিশ্বাস করার কী দরকার ছিল! প্রায় সন্ধ্যার তার অভিযোগ গুলো যদি তখনই ভেবে দেখতাম তাহলে আমার আরব্য রজনীর শাহজাদি কি আজ মুদির দোকানের সদাই বেচার

ঠোঙা হয়? মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, 'কী করছোস বই দিয়া?' আর সে কিনা আমার শার্টের বোতামের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে উত্তর দেয়– 'আমি নেই নাই!' গতকাল নগদে দেখি, ওপাড়ার সামাদ ভাই এই বইয়ের পাতার ঠোঙায় আয়েশ করে চানাচুর দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে। তার কাছে এই ঠোঙা কোথায় পেলো তা জানতে চাইলে ও জানাল যে, মুদির দোকান থেকে কিনেছে আর তখনই মনে পড়ে গেল তৃষা প্রায়ই বলত, 'সারাদিন কী পাইছো, খালি নিয়া পইড়া থাকো এক বই! আর, তোমার মুখে য্যান কুনো গপ্পোই নাই, এক অবন্তীর ছাড়া। যত্তুক, এই ছিঁড়া বইটার যত্ন নেও, সুময় দেও— তত্তুক তো আমারেও দেও না!' খেয়াল করতাম কথাগুলো বলার সময় ওর ঠোঁট আর গাল শক্ত হয়ে যাচ্ছে, ছুঁড়ে দেওয়া তীব্র দৃঢ় চাহনি আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন, ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য ঘৃণ্য প্রভুর দিকে তাকিয়ে আছে নীরবে। যদি পারতাম এই বিদঘুটে চুপচাপ সন্ধ্যাটাকে ফুটো করে বেরিয়ে সেই গাঢ় নীল মুখর সন্ধ্যায় গিয়ে মেতে থাকতে, তাহলে গীর্জায় গিয়ে আগে দু দন্ড প্রার্থনা করতাম– 'হে ইশ্বর, তুমি আমার বইটা ফিরয়ে দাও।'

রুমের চার দেয়াল যেন একজন আরেকজনের হাত ধরে আমাকে ঘিরে ঘুরছে তো ঘুরছেই। আমার চোখ বাঁধা; আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি— ঘূর্ণমান চার দেয়াল আমার দিকে আঙুল তাক করে অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ছে, এক দেয়ালের মাথা ঠোকাঠুকি খাচ্ছে আরেক দেয়ালের কপালে। এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-তামাশার আওয়াজ তাদের গায়ে যেন আছড়ে পড়ে প্রতিধ্বনি তুলছে আর আমার অসহায়ত্ব এইসব আওয়াজের পায়ে মাথা কুটে কয়েকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ভিক্ষা চাইছে।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে থাকা এর চেয়ে বরং স্বস্তির। অন্ধকারে দু একটা গাছের আবছা শরীর যতটুকু নজরে আসে, সেদিকে ছুটে গিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসতে পারলেই যেন শান্তি। জানালার শিকে মাথা ঠেকিয়ে ওভাবে কতক্ষণ বাইরে তাকিয়ে আছি, ঠিক ঠিক মনে করতে পারছি না। দূরে, গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা ছেলে-মেয়ে বড় এক আগুনের কুণ্ডের চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে। তাদের মাঝে মুদি দোকানীর ছেলেটার গড়ন হালকা বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো আজ এই সন্ধ্যায় আমার মুদির দোকানে যাওয়ার কথা। কেননা এই সময়টাতে দোকানে ভিড় একদম থাকে না বললেই চলে। এবং এটাই কাজ হাসিল করার মোক্ষম সময়।

হাতের পাতার উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসি। বিছানা থেকে নেমে জুতোয় পা গলাতে গিয়ে দেখতে পাই জুতোর একটা ফিতে ছিঁড়ে; নিচের দিকে ঝুঁকে ছেঁড়া ফিতের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে কিছু একটা মনে করতে চেষ্টা করলাম। আমার মনে হয় আজ সন্ধ্যায় বাজারে যাওয়ার কথা ছিল; ছেঁড়া জুতোটা সারিয়ে আনা, পালং শাক, একটা ব্লেড, বারান্দার ভাল্ব সেই পরশু দিন থেকে নষ্ট, নতুন একটা কিনে আনার কথা। ধুর! চুলোয় যাক বাজার!

বিছানা থেকে গল্পের বইটা তুলে টেবিলের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেই। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে উড়ে গিয়ে পড়ে টেবিলের একেবারে কোণায়। এই সাধারণ নির্দোষ বইটাও মুদির দোকানে ঠোঙা হয়ে যেতে পারে, বিশ্বাস নাই! কোণা থেকে তুলে নিয়ে খাতার মাঝখানে সেঁধিয়ে রাখলাম।

বাইরের সেই অগ্নিকুণ্ডের উদ্দেশ্যে উঠানে পা রাখতেই ঠান্ডা বাতাস, আমি যে ঘর থেকে বাইরে বের হয়েছি, তা মনে করিয়ে দেয়। এইমাত্র খেয়াল হলো তৃষাকে সেই বিকেল থেকে কোথাও দেখছি না। আজকাল ও যথাসম্ভব আমার ছায়া এড়িয়ে চলে। সামনে পড়ে যদি যায়ও, মাথা নিচু করে থাকে; আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি।

রান্না ঘর থেকে মা'র তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে ভেসে আসে—

'নবাবের পুত, আতুর ঘর থাইকা বাইর রইছো?'

এসব আমার মুখস্থ। কিছুক্ষণ গজগজানির পর আপনা আপনি থেমে যাবে। আমার দৃষ্টি গিয়ে স্থির হলো মায়ের পান-খাওয়া বড় বড় দাঁতগুলোর উপর; কথার তোড়ে যেন ওগুলো বের হয়ে আসতে চাইছে। সোলাইমানের সাপটার চোখের মতো আমার চোখ থাকলে এখনি পুড়িয়ে যেন ছাই করে দিতাম তার মুখমণ্ডল! যখন রাস্তায় পা রাখলাম, মা'র ছোঁড়া বর্শার ফলার কয়েক টুকরো তখনো কানে এসে বিঁধছেঃ

'বড় পোলা! এ্যা— বড় পোলা! এডা কামে যদি হাত দিত! এইডা কোনো মানুষ হইলো নাকি! এই যে গেলি আর য্যান বাইত না ফিরস! কই যাবি, কইরা খা-গা!'

আমাদের বাড়ি ছেড়ে আরেক বাড়ির উঠোনে পা রাখি। সামান্য দূরে, খড়-কুটোর আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে চুল্লির মত, আর কয়েকজন সে আগুনের

আঁচ থেকে বাঁচতে কুণ্ড থেকে সরে এদিকে মুখ করে বসে আছে, মুদির ছেলেটা এখন দাঁড়িয়ে, আগুনের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে— আর একমাত্র যে মেয়েটা সমানে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে খানিক বাদে বাদেই হেসে কুটিকুটি হচ্ছে, সে তৃষার খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। লাল শিখায় তার হাত মুখ জ্বলছে। আমি সামান্য এগিয়ে মুদির দোকানে পৌঁছার রাস্তার দিকে এগুতে থাকি।

বেচারা সোলাইমানের জন্য খারাপ লাগে। তার এখন সঙ্গতা দরকার। এখন এই আমার গাঁয়ের গাঢ় সন্ধ্যার কুয়াশা-অন্ধকার-ধুয়োর যে মুহূর্তটায় বন্দি হয়ে আছি, যদি এখান থেকে বের হতে পারতাম! তবে, আমি যে সোলাইমানের সাথে একটা সন্ধ্যা কাটাব বলে নিজের মনে স্থির করেছিলাম, এটাই হতে পারে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আবছা অন্ধকারে গনগনা আগুনের চুল্লির চারধারে আমি আর মৃত এক রূপসী তার মুখোমুখি বসে থাকব। সেদিনও থাকবে এমনি অন্ধকার। সে গালের এক অংশ গামছা দিয়ে ঢেকে উদাস সুরে গল্প বলে যাবে।... আর কী আশ্চর্য, মুহূর্তেই সামনের থমথমে বাঁশঝাড়, পাশের নির্লিপ্ত মাঠ, এই নিঃসঙ্গ কুয়াশা, বুড়ো আকাশ আর তেজি ধোঁয়া হয়ে গেল পারস্য সীমান্তের নিকটবর্তী পাহাড়ি কোনো কনকনে শীতের গাঁ!

লম্বু সোলাইমান বলে যায়—

'আমি পনের তুমানে সাপটা বেইচা দিছি।'

মৃত রূপসী জানতে চায় যে, সে এই কাজ কেন করল। তার উত্তরে সোলাইমান ডান গালের উপর থেকে আস্তে আস্তে গামছা সরায়; আমরা দেখতে পাই, সেখানে গাল বলে কিছু নেই— একেবারে মাড়িতে ঝুলে থাকা সাদা দাঁতগুলো লজ্জায় যেন লালচে হয়ে গেছে। অপর যে গাল সেই মৃত সঙ্গির শোকে বিষণ্ন আর উদাস, তা আবার কেঁপে ওঠে, বলেঃ

'বেইচা দিছি, ভাবলাম— দরবেশরা যেহেতু বলল, সাপটা একলা একলা শীতে কষ্ট করব, তারা বরং ভাল ভাল খাবার দিবো, মখমলের কাপড়ে শোয়াব, তাছাড়া আমি ১০ তুমান দিয়া একটা বলদ কিনবার পামু! সে তো আর জানবো না যে, আমিই তার গর্ত দেখায়া দিছি। কিন্তু দরবেশরা মোহনীয় বাঁশির জাদুতে যখন বশ করে, বন্দী করে লোহার সিন্দুকে, গাঁয়ের মেলা মানুষে ঘিরা রাখছিল তাগোর আর সেই ভীড়ের মধ্যে যখন সাপটা আমারে দেখে, ভয়ংকরভাবে

খেইপা যায়। য্যান লোহার সিন্ধুক ভাইঙা বাইর হয়া আসবো; যখন আমার চোখে চোখ রাখে, আমি পাথর হয়া যাই। আর তখনই ছাড়ে সেই হলদে থুথু। আমার ডানগালে আইসা পড়ে।'

মাথার উপর নিঃসঙ্গ কুয়াশা; নিচে চুল্লির চারপাশে আমরা— আমি, মৃত রূপসী আর সোলাইমান। কাঠের গনগনা আগুন; সেই চুল্লির লাল আলোয় মৃত রূপসীর চোখ চকচক করে ওঠে। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, আরব্য রজনীর শাহজাদির সাথে তার দেখা হয়েছিল কিনা। কিন্তু সেই সময় লম্বু সোলাইমানের কণ্ঠ আবার শুনতে পাই। হঠাৎ তার গলার স্বর, বলার ভঙ্গি বদলে যায়— কেঁপে ওঠে তার গলা!

'সেই বলদ বেইচা বউয়ের জন্য কামিজ, আর মেয়ের চিকিৎসা করাইছি। আমার নিজের ছায়া সাক্ষী।' অনেক দূরে প্রথমে একটা শেয়াল তারপর আরো কয়েকটা শেয়াল একসাথে ডেকে ওঠে— হুক্কা-হুয়া। সোলাইমান 'আপনারা বহেন' বলে গনগনা আগুনের চুল্লির পাশ থেকে উঠে পড়ে। আগুনের রং টকটকে লাল। ছুটে যায় ঘরে তারপর ফিরে আসে শিকারের সেই বন্দুক সাথে নিয়ে। এখনো ঠিকঠাক কাজ করে কিনা তা দেখে নেবার উদ্দেশ্যে আকাশে একটা গুলি ছোটায় সে। ধ্রুম করে একটা শব্দ নিস্তব্ধ উঠোনে প্রবল আওয়াজ তুলে আছড়ে পড়ে। কোথা থেকে একটা তিতির উড়ে এসে বসে সোলাইমানের কাঁধে।

মৃত রূপসী আর আমি খেয়াল করলাম, কে যেন সময় থামিয়ে দিয়েছে; সন্ধ্যা যেন আর ফুরাচ্ছেই না। সুতরাং আমাদের বয়সও বিশেষ এক মুহূর্তে এসে থেমে আছে। কতদিন ওর চোখে রামধনু খুঁজি না! চোখে একলা সবুজ একটা দ্বীপের ছবিও আঁকি না সেই তিন হেমন্ত থেকে— বহুদিন পর আরেকবার ওর চোখে-মুখে সবুজ দ্বীপ আঁকার ইচ্ছে জাগে; আমি তাকায় তার দিকে। মৃত রূপসীর পাতলা ঠোঁট কেঁপে ওঠে। ওর দিকে তাকিয়ে ভয়ে আমি চিৎকার দিয়ে ওঠলাম; গায়ে একটা সুতোও নেই ওর। সোলাইমান আবার চুল্লির পাশে এসে বসল, কাঁধে হাত রেখে আমাকে যেন আশ্বাস দিচ্ছে, এমন স্বরে বলে, 'ইয়াং ম্যান, এখনি তো তোমরাগো সময়!'

জঙ্গল থেকে একটা খরগোশ ছুটে এসে সোলাইমানের কোলে লাফিয়ে পড়ে। সে তার পিঠে নরম করে হাত বোলাতে থাকে। ঘর থেকে তার সবচেয়ে ছোট্ট মেয়ে ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে, বায়না ধরে, 'আব্বু, আমি কোলে

ওঠবো।' হঠাৎ কী মনে করে এক জটকায় উঠে দাঁড়ায় সোলাইমান; খরগোশটা কোল থেকে ছিটকে পড়ে গনগনা আগুনের চুলোয়।

'আয় মা, কাছে আয়, কোলে নেই।' মেয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়। সবচেয়ে এই ছোট্ট মেয়েটাকে এক পলকে উপরে তুলে নেয় লম্বু সোলাইমান; তারপর সজোরে এক আছাড় মারে। মেয়ে গিয়ে ছিটকে পড়ে উঠোনের এক কোণায়।

খরগোশের পোড়া গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারে। এই সময় মৃত রূপসী বিষণ্ন গলায় বলে ওঠে, 'লোকটা দেখো কী অদ্ভুত! অদ্ভুত সব কাজ করছে। আর কেমন দুর্বোদ্ধও ঠেকছে আমার কাছে। মনে হয় সে অমর হতে চায়।' সোলাইমান আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে, তারপর ঘোষণা দেয়—

'আইজ রাইতে আমরা পুড়া খরগোশ দিয়া নাস্তা সারমু।'

ঘর থেকে একটা ছায়া দ্রুত পায়ে ছুটে আসে আমাদের দিকে। কাছে এসে সোলাইমানের দিকে আঙুল তাক করে জানতে চায় যে, তার মেয়েকে খুন করা কেন হলো। রাগে ক্ষোভে ছায়াটি যেন তিরতির করে কাঁপছে। সোলাইমান তার উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। বউয়ের দিকে নিশানা তাক করে নিঃসঙ্কোচে ট্রিগার চাপে। চারপাশের পাহাড়ের গায়ে শব্দটা ধাক্কা খায়; কেঁপে ওঠে ওঠোন। সেই শব্দে তিতির ভয় পেয়ে উড়ে যায়। বন্দুকের নল থেকে বের হওয়া ধোঁয়া ফুঁ দিয়ে কমাতে চেষ্টা করে সে। এই কাজ অসমাপ্ত রেখে সোজা আমার দিকে চোখ রেখে বলে ওঠে—

'কাউরে বিশ্বাস করবা না। এমনকি নিজের বোনরেও না।'

আর তখনই অবাক হয়ে লক্ষ করি, সে বন্দুকটা উঠোনের এক পাশে ছুঁড়ে মারে; তারপর কোদাল নিয়ে বড় পাহাড়ের দিকে ছুটে। একটা চাপা উদ্বেগ মৃত রূপসীর চোখ থেকে শিশির হয়ে ঝরে পড়ে। আমি যাতে তার ভেতরের লুকানো আবেগ বুঝতে না পারি, তাই যথাসাধ্য স্বাভাবিক গলায় সোলাইমানকে জিজ্ঞেস করে, 'কোদাল নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে, শুনি?'

সোলাইমান নিরাসক্ত গলায় উত্তর করে—

'কবর খুড়তে।'

—'কার কবর!'

—'আমার নিজের।'

খুব ইচ্ছে ছিল মৃত রূপসীর কাছে চুল্লির পাশে বসে শাহজাতির গল্প শুনব। ও আমাকে 'এক সহস্র এবং এক রাত্রির' পরের রাত্রের গল্পগুলো শুনাতে চেয়েছিল। হঠাৎ সে ইচ্ছা উবে গেলো মুহূর্তে। আমি রেগে গিয়ে চিৎকার করে ওঠলাম, 'তুমি এক মৃত জানোয়ার।' চোখে গভীর বিষণ্নতার ছায়া ঘনিয়ে এলো মৃত রূপসীর, ধীরে ধীরে বলে ওঠল, 'মৃত, সেতো তুমিও! এমনকি, সবাই!'

কনকনে ঠাণ্ডার এই সন্ধ্যায় খরগোশের পোড়া গন্ধ যখন দূর পাহাড় পর্যন্ত ছেঁয়ে গেছে, সোলাইমানের বড় ছেলে ছুটে আসে আমাদের দিকে। মাথা নিচু করে ভীত গলায় বলে যে, তার অপর দুই বোন আত্মহত্যা করেছে। পড়ে আছে খাটের নিচে। তাদের মুখে ফুটে আছে অদ্ভুত এক ভয়ংকর হাসি। শুনে কিছুক্ষণ তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, তারপর তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে পরামর্শ দেই, 'যাও, যদি গন্ধ করা শুরু করে, উপরে মোটা চটের ছালা দিয়ে ঢেকে রাখো, তারপর খাটের উপর নিশ্চিন্তে গিয়ে ঘুমাও।'

মুদির দোকানের টঙে কখন থেকে অথবা কেনইবা বসে আসি, কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে গেছে। দোকানে একটা মোমবাতি ধিকিধিকি করে জ্বলছে; দোকানি একা বসে বসে ঝিমুচ্ছে। পায়ের কাছে গুটিসুটি একটা বেড়াল। সোলাইমানের সেই দুই মেয়ে, যারা কিনা খাটের নিচে মরে পড়ে আছে, তাদের চোখে-মুখে যে মৃদু কৌতুক মেশানো বিজয়ীর হাসি ফুটে ছিল, তা যেন আমার মুখেও ফুটে ওঠল। আর, ঠিক সে সময় বাড়ির কাছাকাছি থেকে ছুটে আসা একটা করুণ আর্ত চিৎকারে আমি চমকে ওঠলাম—'ও ভা- আ- ইইই!'

এতো তৃষার কণ্ঠস্বর! কী হয়েছে তার? কোনো খারাপ কিছু নাতো? নাকি ভুল শুনলাম? স্পষ্ট শুনলাম যে!

যখন ওর কিছু বোঝার বয়সই হয়নি, সেই ছোটোবেলার এক সকালের টুকরো কথা, ছেঁড়া দৃশ্য চোখের সামনে নাচতে থাকে। আমি পলাতক। আমার

মাথা নিচু... ও কাঁদছে... হাতে ধরা দুটো টাকা... মা'র শক্ত মুখ... 'মা রে কইছি! বাইত নিবো তোমারে!'

আমি দোকান থেকে উঠে, শব্দ যেদিক থেকে আসছে, দ্রুত সেদিকে ছুটতে থাকি...

নভেম্বর, ২০১৩

সালমান রুশদী ও ভিখারি পুত্র

কর্নেল স্যারের সাথে তাকে একি টেবিলে বসে থাকা অবস্থায় দেখেই চিনে ফেলি এই লোক সালমান রুশদী। অথচ এ যে স্যারের ছোট ভাই তা এতদিন জানতামই না। এখন দেখে মনে হচ্ছে, হ, ঠিকই ত আছে, দুইজনের চেহারায় মিলই আছে দেখি। কিন্তু আগে কেন তাদের এই আত্মীয়তার ব্যাপারটা মাথায় আসে নি, এটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ছোট রুম। রুমের মাঝখান দিয়ে আবার চিকন পিলার। দেয়াল আর পিলারের গায়ে কী সব হাবিজাবি অসংখ্য লেখা। উনারা কীসব আলাপ পাড়ছেন? জমি-জমা ব্যবসা-পাতি সংক্রান্ত হয়ত। বড় ভাইয়ের সাথে আলাপ শেষে উনি একটু বাইরে বের হলেন। এই সুযোগে আমিও পিছু নিলাম। এমন সুযোগ কি আর আসে।

গ্রামে, আমার দুই ক্লাশমেটকে এই খবরটা দিতেই ওরা আমার সাথে রওনা দিল। ফিরে এসে দেখি উনারা আবার সেই রুমের মধ্যেই বসে বসে আলাপ পাড়ছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আঙ্কেল, আপনার শেষ উপন্যাস তো Remember...' ধুর ছাই, পণ্ডিতি করতে গিয়ে ত দেখি ধরা খাবার যোগাড়! শেষ উপন্যাসটা যেন কী? কিন্তু আমাকে বেশিক্ষণ দুঃচিন্তা করতে হল না। উনি যেখানে বসে আছেন, অই ত তার পাশের পিলারটার গায়ে হিজিবিজি অসংখ্য লেখার পাশেই সেই নামটা কী সুন্দর ফুটে আছে! দ্রুত উত্তর করলাম: Awoke to Way of Remember (এই শব্দগুচ্ছের মানে কী?), তাই না আঙ্কেল?

কর্নেল স্যার খুশি হয়ে ওঠলেনঃ 'বাহ, তুমি দেখি চিনো ওকে!' আমি সলজ্জ হাসি দিয়ে বলি, 'উনার সব লেখা আমার পড়া!' বলেই মনে মনে আঁতকে ওঠলাম! আমি তারপর উনাকে জানালাম যে, উনার একটা ছোটগল্প আমার খুব ভাল লেগেছিল। কর্নেল স্যার গর্বের সাথে ভাইয়ের দিকে ফিরে ঘোষণা দিলেন:

'ওর সব লেখাই ভাল!' মিডনাইট চিলড্রেনের কথাও বললাম। কর্নেল স্যারের সাথে তাল রেখে বললাম যে, এই বইটা বিশ্বে খুব নাম কামাইছে। আমার পেছনে দাঁড়ানো আমার সেই মুখচোরা ক্লাশমেটটি দরজার ওপাশ থেকে মুখ বাড়ায়। মিহি আর মেয়েলি গলায় বলে, 'আমিও চিনি উনারে।' আমি এবং জাহিদুল (আমার সহপাঠী) যে তার ভাই সালমান রুশদী কে এতভাবে চিনি তা দেখে এবার রীতিমত অবাক হলেন কর্নেল স্যার। তিনি ভাইয়ের দিকে সগর্বে তাকালেন, সবিস্ময়ে বলে ওঠলেন: 'তোকে এত মানুষ চিনে!' রুশদী সাহেব এবার মুচকি হেসে তার ভাইয়ের দিকে করুণার চোখে তাকালেন। মনে মনে বললেন, শালার আর্মিপার্সনগুলা সব এমনই কুয়ার ব্যাং হয়, আর নিজেকে ভাবে জ্ঞানের সাগর! সে হোক নিজের ভাই কিংবা নাম-না-জানা যদুর ভাই! কিন্তু প্রকাশ্যে চোখে-মুখে বিনয়ের ভাব ফুটে তুললেন। আস্তে করে মাথা নিচু করেন, মৃদু প্রতিবাদের স্বরে ভাইকে বললেন, 'শুধু এরা না, আমারে বিশ্বের নানান মানুষ চিনে! আমি যখন বিশ্বের নানান প্রান্তে ঘুরে বেড়াই, তখন গাড়ি-ঘোড়া নষ্ট হলে, ওরাই ত ঠিক- ঠাক করে দেয়।'

এরপর সবাই যখন যে যার মত চলে গেল, তখন সেই রুমে শুধু আমি আর উনি। জানতে চাইলাম গল্প লেখার ক্ষেত্রে কোন স্ট্র্যাটেজি উনি ফলো করেন। উনি উত্তর না দিয়ে শুধু মুচকি হাসলেন! আমিও নাছোরবান্দা। এমন সুযোগ কি আর বছর বছর আসে নাকি! 'অনেকে গল্প লেখার আগেই মাথায় সমস্ত খুঁটিনাটি ভেবে রাখেন, তারপর একটানে লিখে ফেলেন। আবার অনেকে, মাথায় শুধু স্ট্রাকচার বা আবছা ধারণা নিয়ে লিখতে শুরু করেন, তারপর লিখেন আর ভাবেন, নোট নেন, ধীরে ধীরে লেখাটা কমপ্লিট করেন। আবার কেউ কেউ... আপনি কীভাবে লিখেন, স্যার?' কিন্তু উনি সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে আবারও মৃদু হেসে বলেন, 'ঐ হল একভাবে...' বলেই আর দেরি করলেন না। ওঠে রাস্তায় নামলেন।

আমিও রাস্তায় নামলাম। একা। হাঁটতে হাঁটতে একবার ভাবলাম, ফিরে যাই। গিয়ে উনার সাথে একটা সেলফি তুলি। ফেসবুকে আপলোড দিতে পারব। কিন্তু আমি ভেবে পেলাম না, এর আগে অনেক নামি-দামি লোককে দেখেছি যারা উনার সাথে একটা ছবি তুলতে পেরে কী উচ্ছ্বসিত ভাবেই না প্রচার করেছে! পত্রিকায় দেখছি। পাগলামি আর কারে কয়! ছবি টবি তুলার কী দরকার!

হাঁটতে হাঁটতে যে মোড়টাতে আসলাম তা মিরপুর-১০ এর গোলচক্কর হবে খুব সম্ভব। শুধু মানুষ আর মানুষ। কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি নাই কোথাও। মাথার উপর কুপি আর হ্যাজাকের আলো। দোকানগুলোতে পুড়ছে মোম। লোহার ফ্লাইওভারের পাশেই কিছু ঝটলা। বসে আছে দুটি ভিখারি পরিবার। ছেলে-মেয়ে, মা-মেয়ে, বাপ-জ্যাঠা। তাদের ভেতর থেকে একজন ওঠে এসে আমার পাশে দাঁড়ায়। হন্তদন্ত করে বলে, নিচ দিয়া যাইয়ো না। এই ফ্লাইওভারের নিচ দিয়া গেলে পুলিশ ধরব। তারপর চালান করব কুটে। আমি ভয় পেয়ে যাই। সে আমার ভীত মনের অবস্থা টের পেয়ে হাত ধরে টান মারে। বলে, আমরা এই ফ্লাইওভার বাইয়া বাইয়া ওঠমু। ওঠো। আমি গাছ বাওয়ার মত করে লোহা ধরে ধরে ঝুলতে ঝুলতে উপরে ওঠতে থাকি। আমার ঠিক পেছনেই সেই ছেলেটা। তারপর হঠাৎ খেয়াল করি, ও আমার একেবারে উপরে ওঠে পড়েছে। প্রায় ঝাপটে ধরে আছে। কী ব্যাপার, শালার ব্যাটা গে নাকি? তীব্র ভয়ের শিহরণের স্রোত বয়ে যায়। একবার ভাবি, চিৎকার দিয়ে ওঠব নাকি? কিন্তু এত এত মানুষের কোলাহলের ভিড়ে কে শুনবে আমার চিৎকার? এটা বুঝতে পেরে অসহায় বোধ করি। ভাবি, এখন আমার একমাত্র সহায় হচ্ছে, ঠিক নিচের ইটের ফুটপাত আর সেই ফুটপাত থেকে উপরে যেখানে ঝুলে আছি— তার মাঝখানের শূন্যতা। তাই ছল করে তার বাহু থেকে মুক্ত হয়ে শূন্যতার উপর ভর করে নিচে ফুটপাতে আছড়ে পড়ার প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে থাকি...

২০১৬

বিগ ব্রাদার

একটা যুবকের ছায়া। ছায়াটি দাঁড়িয়ে আছে একটা বেডরুমের দরজার সামনে। দুইহাত আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর ভাঁজ করা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দরজারটার দিকে। এখানে আসার আগে কার্যপরবর্তী সময়ে কী কী সমস্যার সম্মুখীন সে হতে পারে, সেসবের ছক কষা হয়ে গেছে। কীভাবে কী করলে পরে আর তাকে কেউ অভিযুক্ত বা সন্দেহ করতে পারবে না, সেই অংক কষেছে একেবারে হাতে কলমে। তবুও আসল কাজে হাত দেবার আগে পুরো প্রক্রিয়াটা আরো একবার পর্যালোচনা করে দেখা দরকার।

দেশে একেকটা আলোচিত খুন ধর্ষণ হয়ে যাবার পরে মোটামুটি সবাই আন্দাজ করতে পারে সেগুলোর পেছনে কে; তবুও কেউ তাদের একটা কেশও উত্তোলন করতে পারে না, আর সেখানে সে তো কাজটা করতে যাচ্ছে খুবই সাবধানে। ধরা পড়ার কোন চান্স নেই। তবে, যদি বাই চান্স ধরা পড়েই যায়, তাহলে রক্ষা নেই, এটা সত্য; আর সে কারণেই তো এতো সতর্কতা।

অন্যমনস্কভাবে ওভাবে কতক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে ভাবতেছিল, ঠিক মনে করতে পারল না। অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে আছড়ে পড়ে দরজার গায়ে। স্থবিরতা কাটিয়ে ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে আন্দাজে কিছু একটা খোঁজে, তারপর একটা চাবি বের করে আনে। মাস্টার কী। দরজা খুলতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। খুলে, বিড়ালের মত নরম পায়ে রুমের ভেতরে ঢোকার

উপক্রম করে। কিন্তু তার কেমন যেন সন্দেহ জাগে, পেছন থেকে কেউ বুঝি ওর দিকে তাকিয়ে আছে! ছায়াটি কৌতূহলী চোখে পেছনে তাকায়, কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। শুধু দেয়ালের কোণায় জমাট অন্ধকার। কেউ কোথাও জেগে নেই, নিশ্চিত হয়ে সে এবার নিঃসঙ্কোচে ভেতরে ঢোকে।

রুমের ভেতরে আকাশি রঙের ডিম লাইট। সেই আলোয় আবছা মতো নজরে আসে, খাটের ওপর দুটি মানুষ শুয়ে আছে। সে জানে, এরা কে কে। একজন সেই বুড়ো, আরেকজন বুড়ি। এই আলোয় চারপাশ কেমন মায়াবী মায়াবী লাগছে। হাহ! শালার একটা রোমান্টিক মনও আছে তাহলে? কিন্তু যে মানুষ এমন সৌন্দর্য চর্চা করে সে কীভাবে সারাজীবন শুধু টাকার পেছনে ছুটতে পারে? অথবা এমনও হতে পারে, অন্ধকারকে ভয় পায় বুড়ো?

বুড়ো-বুড়ির যাতে ঘুম না-ভাঙ্গে, এমন সতর্কতায় ছায়াটি খোলা দরজা ভেজিয়ে দেয়। হাতড়ে হাতড়ে লাইট জ্বালায় এবার; এনার্জি বাল্বের কড়া শাদা আলোয় চোখের সামনে সমস্ত দৃশ্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। একটা চেয়ার নিঃশব্দে টেনে নিয়ে খাটের কাছে গিয়ে বসে।

ঘুমের মধ্যে মানুষ কী অসহায়! এই যে সামনে এখন যে মানুষটি বুড়ো বউ নিয়ে শুয়ে আছে, চোখ দুটি খোলা অবস্থাতেই এর কী প্রতাপ! এত বড় মার্কেটে শত শত কর্মী তার নাম শুনেই ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। এমনকি ফোন দিলে হয়ত দশ বারটা মানুষ নিমিষে লাশ হয়ে যাবে; পুলিশ টু শব্দটাও করতে পারবে না। অথচ এখন...

- *এই যে আঙ্কেল!*

আলতো করে ধাক্কা দেয় ছায়াটি।

- *আঙ্কেল...*
- *কে...?*

বুড়োর চোখে বিস্ময় আর রাজ্যের আশংকা। মনে হয়, ছায়াটির পরিচয় এবং এখানে আসার কৌশল আর হেতু খুঁজে বের করতে মনে মনে দ্রুত সমীকরণ কষছে।

- *আমি, আঙ্কেল! চিন্তাবিদ।*
- *মানে? কী চাও?*

- শুনলাম, আপনার বাসায় তিন কোটি টাকা আছে। দ্যান। আপনার টাকা-পয়সার অভাব নাই। আমাকে দুই কোটি দিলেই চলবে...

- আমার টাকা তোমাকে দেব কেন?

- কী বলেন পাগলের মত এইসব! আমি চিন্তাবিদ, সারাদিন বসে বসে শুধু চিন্তা করি, টাকা-পয়সা কামানোর সময় পাই না, তাই বলে কি আমার চাহিদা নাই নাকি? খাওয়া-পরা আছে, থাকতে হয়; এইসব ব্যাপারে আমার কোন প্যাশন নাই। কিন্তু ন্যূনতম দরকারটা তো মেটাতে হয়। এইসব কে মেটাবে?

- আমি তার কী জানি? সত্যি করে বল ত তুমি কে? আর এখানে আসলেই বা কীভাবে?

- আরে মিয়া! এই যে খাটে শুয়ে আছেন, চারদিক ঝলমলে বাতি, এইসব ত আর আপনার মত হ্যাড়মওয়ালারা আবিষ্কার করে নাই, করছে আমার মত লোকেরা, যাদের চিন্তা করাই একমাত্র কাজ! তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে না? এর দায়িত্ব কে নেবে? আমি না আমার বাপ? আমার বাপের সে সাধ্য নাই। আর, বললাম তো আমি চিন্তাবিদ! এখানে কীভাবে আসলাম? চিন্তা করে বাইর করছি আসার পথ!

ইতোমধ্যে বুড়ি জেগে ওঠেছে। ওঠে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে কথাগুলো গিলছে। লোকটা ছায়াটির কথাগুলো বুঝতে পেরেছে এবং দাবিটা যে ন্যায় সঙ্গত, এই এক্সপ্রেশন মুখমণ্ডলে এঁকে নেমে আসে বিছানা থেকে।

- *তোমার দাবিটা বুঝতে পারছি। খুবই ন্যায় সঙ্গত তোমার চাওয়া, বাবা।*

টাকাটা আলমারিতে, তাই আলমারির চাবি নেওয়ার উদ্দেশ্যে সে খাট সংলগ্ন ছোট টেবিলটার দিকে আগায়, ওটার ওপরেই টেবিল-ল্যাম্প।

ছায়াটির মন খারাপ হয়ে যায়। এই এত রাতে এই বুড়ো লোকটাকে কি ডিস্টার্ব না করলে হতো না? কিন্তু দিনে সুযোগ কই? ঘুম ঘুম চোখে ধীরপায়ে তাকে টেবিলটার কাছে হেঁটে আসতে দেখে লোকটার প্রতি মায়া জাগে ওর। সে বিনয়ের সাথে নরম গলায় বলে ওঠে, 'আঙ্কেল, থাক, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আপনি শুধু বলে দিন...' এইটুকু বলার ফাঁকে চাবি নেওয়ার উদ্দেশ্যে ড্রয়ারটায় হাত দেয়, 'আলমারিটা কোথায়?'

কিন্তু কী কর্মঠ বুড়ো! এই বয়সেও নিজের কাজ নিজের হাতে করতে চায় সে। ফলে ক্ষিপ্র গতিতে ছায়াটির হাত সরিয়ে দেয় বুড়ো। ছায়াটি বিনয়ে আরো গলে গিয়ে 'না থাক থাক ছি ছি' বলে অবশেষে ড্রয়ারটা খুলে ফেলে এবং ছয়টি গুলি ভরা রিভলভারটা বের করে আনে। সম্ভবত রিভলভার দেখেই বুড়ো আঁতকে উঠে সরে যায়।

ছায়াটি বিভ্রান্ত বোধ করে। চোখ সরু করে রিভলভারটা উল্টিয়ে পালটিয়ে দেখে। যে তালার এত বড় চাবি, সে তালা না-জানি কত বড়!

- *চাবি পাইছি আঙ্কেল, আসেন।*

বুড়ো অসহায় বোধ করে, রুম থেকে বের হয়ে আসে। গুলির একটা ভোঁতা আওয়াজ শুনতে পায়, আর একটা মেয়েলি ক্ষিপ্র আর্তনাদ। তারপর সব স্তব্ধ। সে ভয়ার্ত গলায় যতটা সম্ভব জোরে জোরে বলতে থাকে, 'শোনো...'

- *আমি কালা না, কানে স্পষ্ট শুনতে পাই। এত জোরে বলার প্রয়োজন নেই।*

ছায়াটির ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফোটে। বুড়ো হয়ত মনে মনে ছেলে, ছেলের বউ আর মেয়েকে ধিক্কার দিচ্ছে। আর ভাবছে, কী কালঘুমেই না ঘুমিয়ে আছে একেকটা। এত জোরে কথা বলল, তবুও যদি একটা লোক বের হয়ে আসে! এদিকে ভয়ানক সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে তার!

গেস্ট রুমে মৃদু আলো জ্বলছে। এর বরাবরই বুড়োর মেজ ছেলের রুম। এই ছেলে যেখানেই হাত দেয়, সাথে সাথে সোনা ফলে। বড় বড় মার্কেট এর কব্জায়। বুড়ো গিয়ে তার দরজায় স্থির হয়। হঠাৎ ছেলের সমস্ত কীর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রশাসনের বড় বড় কর্তারা পর্যন্ত একে গোণায় ধরে কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময়। কী এক দুর্নিবার সাহস ঝাঁপিয়ে পড়ে বুড়োর উপর। বুকে বল পায়। এতোক্ষণ শুধু শুধু একে ভয় পেয়ে আসছিল, কী বোকা সে! চোখের সামনে যে ছায়াটিকে এতোক্ষণ মৃত্যুদূত মনে হচ্ছিল, তাকেই এখন মনে হচ্ছে নিতান্ত এক ছোকড়া! তাচ্ছিল্যের ঢেউ খেলে যায় তার ঠোঁটে। আর, মনে পড়ে যায় বুড়ির কথা! একটু আগে ঘটে যাওয়া দৃশ্যটা স্বচক্ষে দেখে নি বুড়ো, কিন্তু কল্পনা করতে চেষ্টা করে। আলুথালু কাপড়, চোখ মুখ দিয়ে আতঙ্ক যেন ফেটে বের হয়ে আসতে চাইছে। বিছানায় গরম রক্ত। বুড়ি লাশ হয়ে পড়ে আছে

বিছানায়। বুড়ি! তার ৪৫ বছরের দাম্পত্যজীবনের সামাজিক সঙ্গী! আর সে আজ মৃত! প্রবল আক্রোশ জমে ওঠে মনে। কিন্তু বাইরে শান্ত দেখায়।

- *এটাই সেই রুম, এখানেই আমার সমস্ত টাকা পয়সা।*

মেজ-ছেলের রুমের দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বুড়ো। 'আসো, বাবা!'

- *কিন্তু আপনার মেজ-ছেলে তো ঘুমুচ্ছে। বড়টাও ঘুমুচ্ছে ওই রুমে। ছোট মেয়েটাও ঘুমুচ্ছে তার রুমে।*

- *তুমি কী করে জানলে?*

ছায়াটি উত্তর দেয় না। বুড়ো কিছুই জানে না! প্রমাণ রেখে কাজ করার জন্য সে এত ছক কষে কাজে নামে নি! বুড়ো এতোক্ষণ যে চেঁচানিটা চেঁচালো, এরা যদি জেগেই থাকত, তাহলে কি আর সে এখনো আস্ত থাকে! কিন্তু, বুড়ো কি ছেলে ছেলে-বউ কিংবা মেয়ের পরিণতি সম্পর্কে কিছুই আঁচ করতে পারছে না! না, মনে হয়! সে কাঁপা কাঁপা হাতে মেজো-ছেলের রুমের দরজার হাতল ঘোরায়, ঘুরে না, ভেতর থেকে কোন শব্দও আসে না। বুড়ো সম্ভবত এখন ভাবছেঃ কী গভীর ঘুম! ভাই-বোন বউ সবাই মিলে কি আজ রাতে ড্রিংক করেছে নাকি? এবার সত্যই আলমারির দিকে আগায়। ভাবে, টাকার চেয়ে জীবন বড়। রাতটা আগে পোহাক, পই পই করে সব বের করে ফেলবে সে। তার জাল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, ছোকড়া জানে না। সে জানে না, *Big brother is watching him!*

কিছুক্ষণ পর পুনরায় গুলির ভোঁতা শব্দ দেয়ালগুলোর গায়ে আছড়ে পড়ে। ছায়াটি এবার চলে যারার উদ্যোগ নেয়। তার উদ্দেশ্য সফল। হাতে এখন দুই কোটি টাকা। যা চাহিদা ওর, সারাজীবন চলে যাবে। জীবনে তার একমাত্র প্যাশন চিন্তা করা। কিন্তু আর্থিক সমস্যায় সে প্রবল বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছিল অনেকদিন থেকে। এখন নির্ভার। সমস্ত প্রমাণ সে নির্দয় হাতে শেষ করে দিয়েছে।

সেই বিশেষ কক্ষ থেকে বের হয়ে সে আবার ড্রইং রুমে আসে। এখন দ্রুত কেটে পড়লেই সে বাঁচে। আর ঠিক তখনই ছায়াটি শুনতে পায়, মাথার উপরে অন্ধকার একটা কোণ থেকে কে যেন ওকে ডাকছে।

- *কে?*

- *বিগ ব্রাদার!*

সময় যেন থমকে দাঁড়ায়। প্রবল অসহায়ত্ব ঘিরে ধরে। মুহূর্তে চোখের সামনে লক্ষ বছরের চিত্র ফুটে ওঠে। হরিণের পেছনে ধাবমান বাঘ, শিকারীর গুলি, শিকারীর হাতে হাতকড়া!

২০১৫

সাইকোপ্যাথঃ স্টোরি অফ এ সিরিয়াল কিলার

খুশির চোটে সে সিগারেট ধরায়। ঠোঁট গোল করে ধোঁয়া ছেড়ে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে গোল গোল ধোঁয়ার দিকে। সামনে পিঠমোড়া দিয়ে হাত বাঁধা এক তরুণ। লোকটি বসা থেকে ওঠে দাঁড়ায়; তারপর, যেন ভিডিও করছে এমন ভঙ্গিতে দুই হাত বাঁকা করে খুব সিরিয়াস মুখভঙ্গি করে পেছনে ফেরে। বসে থাকা হাত বাঁধা তরুণের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে ওঠেঃ 'ওমনেই থাক, তোর ভিডু হইতেছে!'

—সরি স্যার, বুল অয়া গেছে। বলা উচিৎ ছিল, মাননীয় জনাব, আপনি অমনি থাকুন প্লিজ। আপনার ভিডিও হচ্ছে।

—ভাইয়া, আমি কোনোদিন আর কোন মেয়েকে...

—মেয়েকে কী? খেলবেন না, স্যার? কেন স্যার? না না না...এটা ঠিক না। আপনি খেলবেন। খেলবেন আর সেটা মোবাইল দিয়ে ভিডিও করবেন। কিন্তু আমার একটা রিকুয়েস্ট। এরপর থেকে উন্নত মানের ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করবেন। কীসব চায়না ফায়না মোবাইল দিয়ে ভিডিও করেন। ক্লিয়ার আসে না। তো, আমি আসছি মূলত আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে। স্যার, প্লিজ, মাথাটা উপরে তুলুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এদিকে তাকান। ক্যামেরার দিকে।

—ভাইয়া, এক গ্লাস পানি হবে?

—আচ্ছা স্যার, আপনি কী মোবাইল দিয়ে দৃশ্যটা ধারণ করেছিলেন?

— প্লিজ ভাইয়া, এক গ্লাস পানি!

এবার মুখভঙ্গি বদলে যায় লোকটির। ক্যামেরার মত ভঙ্গি করে বাঁকানো দুই হাতের ভেতর দিয়ে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে থাকে ছেলেটির দিকে। নীরবে কাটে কিছুক্ষণ। তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে ছেলেটি তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, 'নোকিয়া **C2-01...**'

—থ্যাংক ইউ, স্যার! মেয়েটি কোথায় পড়ত?

—গার্লস স্কুলে। ক্লাশ নাইনে।

—ওকে পটালেন কীভাবে, স্যার?

—ওদের বাসা আর আমার বাসা কাছাকাছিই ছিল। আমি নাম্বার জোগাড় করি। তারপর... আর ...

লোকটা তার কথা শুনতে শুনতে ঘোরগ্রস্ত হয়ে ওঠে। কল্পনায়, চোখের সামনে দেখতে পায় সারি সারি বিল্ডিং। আর দেখে— একটা ফুটফুটে সবে কিশোরী-বেলায় পা দিয়েছে, এমন মেয়েকে। আহা... এমন মেয়েকে নিয়ে সে কত যে দিবাস্বপ্নে বিভোর থেকেছে! সে তাদের পায় নি। পায় না। দেখা হয়েছে রাস্তা-ঘাটে, বিদ্যালয়প্রাঙ্গনে, বাসার রেলিঙ্গে হেলান দেওয়া অবস্থায়। দেখে হাহাকারে বুক কেঁপে ওঠেছে, ওঠে। একসময় যেমন টিভিতে এমন সব রূপসী কিশোরীদের দেখত, তখন যেমন বুক কাঁপত, এখন ঠিক তেমনি কাঁপে। ভাবে, টিভি ফুঁড়ে তারা বুঝি বের হয়ে এসেছে! টিভি এখন আর ভাল লাগে না। এইত সামনেই জলজ্যান্ত সেইসব মৃত রূপসীরা। সে দেখতে পায়, ক্লাশ নাইনে পড়া একটা ভারি রূপসী মেয়ে গার্লস স্কুলের ইউনিফর্ম পরে খোলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সেও হেঁটে যাচ্ছে পাশাপাশি।

—এই যে শোনো, তোমার ফোন নাম্বারটা দিবে?

—হ্যাঁ, এই নিন/নাও।

তারপর থেকে প্রতি রাতে অনেক অনেক কথা হতে থাকে দুজনের। সন্ধ্যায় লুকিয়ে চুমু... নগ্ন শরীরে নাক ডুবিয়ে ঘ্রাণ নেওয়া... কাঁধের ওপর মাথা ঠেকিয়ে তীব্র আলিঙ্গন... সারারাত শরীর ছানাছানি... সাদা অপরিপক্ব স্তন... কিশোরীর নাকের ঘন নিঃশ্বাস আর শীৎকার...

'তুমি চকলেট হলে না কেন, মেয়ে? চল, আমরা পালিয়ে যাই। তোমাকে নিয়ে আমি ১০০ বছর গৃহবন্দি হয়ে থাকব।'

এইসব ভাবতে গিয়ে টের পায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি কখন থেকে যে বাড়তে শুরু করেছে, সে টেরই পায় নি। তার আবার ভাল লাগতে থাকে। কেমন একটা ঘোর-লাগা অদ্ভুত সুন্দর জগতে ডুবে ছিল সে এতোক্ষণ।... সাথে ছিল সেই রূপসী কিশোরী...!

কিন্তু... সে তো তাকে কখনো পায় নি। পাবেও না কোনদিন। অথচ, এই ছেলেটা তাকে পেয়েছিল। রসিয়ে রসিয়ে তার শরীর ছেনেছে। স্তন... যোনি... আহ! মেয়েটি কী যে মিষ্টি! আর এই লাটকিরপুত কিনা তাকে পুরো ন্যাংটা করে... হ্যাঁ, এই বেশ্যারপোলা তার স্বপ্নের মেয়েটিকে পটিয়েছে। তারপর তাকে ন্যাংটা করিয়েছে, তারপর কোমল স্তনে শূয়োরের দাঁত বিঁধিয়েছে, তার দুধ-ধোয়া ঠোঁটের সর চেটে চেটে খেয়েছে, অন্ধকার মাতাল পুরীর মত তার উষ্ণ যোনি ছিন্নভিন্ন করেছে! আর, মেয়েটা হাসি মুখেই এইসব করতে দিয়েছে; অথচ, সেও তো এমন সব বীণার ঝঙ্কারে শিহরিত হবার মত অনুভূতির স্বাদ নিতে পারত! সে পারে নি। এই টাউট বাটপারটা পেরেছে! তার স্বপ্নকে সে চুদে দিয়েছে! এই... এই... এই হারামজাদা!

লোকটা ক্যামেরার মত ভঙ্গি করা বাঁকানো হাঁত সোজা করে। ধীর বিষণ্ন গলায় বলে ওঠেঃ 'স্যার, আপনার ইন্টারভিউ শেষ। এখন আপনার রায় ঘোষণা করা হবে।'

ডেস্ক থেকে একটা পুরোনো খাতা আর কলম বের করে আনে, লোকটা তারপর গিয়ে বসে একটা উঁচু চেয়ারে। ময়লা শার্টের পকেট থেকে একটা চশমা বের করে চোখে লাগায়। তার সামনে বসে থাকা হাত বাঁধা ছেলেটি এইসব অদ্ভুত কর্মকাণ্ডের কিছু বুঝতে না-পেরে উৎকর্ণ হয়ে থাকে!

যেন, এতোক্ষণ ধরে চলা তর্ক-বিতর্ক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন শেষে বিস্তারিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে মাননীয় বিচারক মহোদয় চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করতে যাচ্ছেন, এমন সুরে ধীরে থেমে থেমে ভারি নিঃস্পৃহ গলায় লোকটা ন্যাতানো খাতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলতে থাকেঃ

"নির্জনে, একটা সুদর্শন বালিকার সাথে নিজের উগ্র অনুভূতি চর্চা করার পর সেই দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করে ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে আমার কাছে সেই ধারণকৃত দৃশ্যখানা দৃষ্টিগোচর হয় এবং নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের স্বভাবসুলভ কৌতূহলের কারণে আমি তা দেখতে বাধ্য হই। দেখে, তীব্র

হাহাকার আর নিজের ব্যর্থতায় মনোকষ্ট হতে থাকে। আমার সামনের তরুণটি আমার স্বপ্নানুভূতিতে তীব্র আঘাত হেনেছে। এই অপরাধে আমি তার যৌনাঙ্গ অণ্ডকোষ হাত আর ঠোঁট লোহার মুগুর দিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত হবার আগপর্যন্ত থেঁতলে দেবার আদেশ প্রদান করছি।'

ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। লোকটা তার মুখ বেঁধে ফেলে। তারপর টেবিলের ওপর রাখা ঝোলা থেকে লম্বা মোটা লোহার ডাণ্ডা বের করে।

ছেলেটার অণ্ডকোষ আর শিশ্ন থেঁতলে দেবার সময় সে পরম তৃপ্তি বোধ করে। কল্পনা করতে থাকে, মেয়েটির শরীরের যে যে অংশে ছেলেটার ছোঁয়া লেগেছিল, সেইসব অংশ থেকে সেইসব ছোঁয়া স্পর্শ শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। সে হয়ে ওঠছে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। একটা ঢেউ খেলা শিহরণ সারা শরীরে খেলে যাচ্ছে। খুশিতে হিহিহি করে হাসে আর সারা ঘর ছুটে ছুটে গুণগুণ করে গান গায় সে। ঘন ঘন শিহরণের তোড় সামলাতে না-পেরে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে, তারপর ঠোঁটের নিচে রক্ত জমাট বাঁধার আগপর্যন্ত ওভাবে দাঁত দিয়ে চেপে ধরেই থাকে লোকটা। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে।

অনেকক্ষণ পর সে খেয়াল করে, রুমজুড়ে চামচিকা, ইঁদুর আর ঘোমটের ভ্যাপসা গন্ধ! সে এবার আরেকটা সিগারেট ধরায় এবং পকেট থেকে লাল রঙের দামি নোটবুক বের করে। তাতে দামি জরির কালিতে লিখে—

আলামিন,

বয়সঃ আনুমানিক ১৯,

ঠিকানাঃ বেইলি রোড, ঢাকা,

ক্রিমিনাল আইডেন্টিফিকেশন সোর্সঃ আপাতত অপ্রকাশ্য,

সিরিয়াল নাম্বারঃ ৭৩।

২০১৫

পোড়া পাণ্ডুলিপির আর্তনাদ

আমাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে, উত্তর বন্দের ধার ঘেঁষে যে লম্বা আর প্রশস্ত রাস্তাটি চলে গেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চোরের মতো এদিক-ওদিক নজর বোলাই। চারপাশ ঘিরে আছে কুয়াশা; খুব ঘন করে না হলেও রাস্তা থেকে কেউ খেয়াল করলেও সহজে বুঝতে পারবে না বোধহয় যে, খানিক দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা আসলে কী করছি সেখানে! ধোঁয়া আর আগুন দেখে বড়জোর ভাবতে পারে 'পোলাপাইন আগুন তাফাইতেছে'!

খাড়া সড়ক বেয়ে নিচে ঢালু ক্ষেতে নামার জন্য আমরা পা বাড়াই। রবিন আমার দিকে তাকিয়ে আহ্বান করে যে, আমি যেন সামনে থেকে আগে নামি। নিচে নামতে নামতে অনুভব করি, ভালো লাগার একটা অনুভূতি সমস্ত মন ছেঁয়ে আছে; তাদের জন্য কিছু করতে যাচ্ছি, তারা খুব খুশি হয়েছে এতে— ভেবে সুখ পাচ্ছি। এখানে আমরা সাতজন।

খোর্শেদ জানতে চায়, আমি কীভাবে বইগুলো যোগাড় করলাম। রশিদ ডানদিক থেকে খুশুর কৌতূহল মেটায়, 'পাঠাগার থাইকা!'

আমি ব্যাপারটা তাদেরকে খোলাসা করিঃ আমি রশিদ-রে আগে কইছি পাঠাগারে এরহম এরহম বই আছে। সে আর আমি পাঠাগার থাইকা বইগুলা পড়ার কতা কইয়া বাইর করি। সঙ্গে রুবেলও আছিল। হে তো টুফি আর পায়জাম-পাঞ্জাবি পইরা আছিল, তো পাঠাগারের বেঠি, অংকনের মাও, কয় কী, কয়— 'মুন্সি মাইনসেও এইসব পড়ব নাহি?' আমি তাড়াতাড়ি কইলাম— 'না না! আমি একলাই।' 'দেইখো, পইড়া আবার য্যান আল্লারে ভুইলা যাইয়ো না।'

কথাগুলা বলার সময় যে বেশ উত্তেজিত ছিলাম, প্রথমে বুঝতে পারিনি; খেয়াল হলে দেখি— রাস্তা থেকে বেশ দূরে চলে এসেছি আমরা। এতগুলো

মানুষ, আর তারা এখন বেশ উত্তেজিত, তাদের হাসিখুশি মুখ— এবং, তাদের এই সুখি হাসিখুশি মুখের একমাত্র উপলক্ষ আমি। এই সন্ধ্যাটাকে তারা উত্তেজনা আর সুখের অনুভূতিতে ভরিয়ে রাখতে পারছে নিজেদের একমাত্র আমার কারণে, ভেবেই তৃপ্তিতে ভরে ওঠে মন। কল্পনায় ভেসে ওঠছে একটা চিত্রঃ গোলাকার বৃত্তটায় আমি মাঝখানে। এরা সবাই মুগ্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর বলছে, 'বাহ! আমরা সুখি! তুমি একটা কামের মতন কাম করছো, মিয়া!'

কোলকাতার বিখ্যাত এক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত, বেশ মজবুত বাঁধাই, পাতাগুলোও মোটা আর শক্ত; বাঁধাই খুলে খুলে ছড়িয়ে দিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। মোট তিনখণ্ডের শেষখণ্ড আইনাল হকের হাতে, সে ছিঁড়তে ছিঁড়তে আমাদের দিকে তাকায়, বইটার দিকে ইঙ্গিত করে বলে, 'একটু পরেই তোরা সব মা আগুনের প্যাটে যাবি। তারপর গু হয়্যা বাইর হবি।' আমরা সবাই হেসে ওঠি জোরে জোরে।

রাস্তা দিয়ে কারোর পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে হঠাৎ। আমরা চুপ হয়ে যাই। কান খাড়া করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শব্দের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষায় থাকি। অন্ধকার থেকে এসে আবার অন্ধকারেই হারিয়ে যায় শব্দটা। কেউ একজন তাড়া দেয় আমাদের। রবিন শান্ত গলায় বলে ওঠে, 'এতো ডরের কী আছে? কেউ আইলে কমু আগুন তাফাইতেছি।' আমার দিকে ফিরে সমর্থনের আশায় আমাকে প্রশ্ন করে, 'কি কও, চাচা?'

কে যেন ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে দেয়। তারপর হাতে ধরে রাখা কয়েকটা ছেঁড়া পাতার প্রান্তে ছোঁয়ায়। পাতা বেয়ে বেয়ে জ্বলে ওঠে আগুন। সেই আগুনের আলোয় তাদের মুখ ঝলমল করে ওঠে। সবার ভেতর থেকে কোনো একজনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'শালা, নাস্তিক!' এখন বেশ একটা অগ্নিকুণ্ড হয়ে গেছে।

—বাড়ি কই এই লেখকের?

—কোলকাতায়।

—শালারে উবতা কইরা চুদন দরকার।

—এ রহম আরো পাইলে খালি জানাবা।

—আইচ্ছা

—তারপরের কাম আমগো।

পাতা পুড়ে কভারে পৌঁছে গেছে আগুন। শক্ত, তাই পুড়ছে ধীরে ধীরে— আমি চুপচাপ তাকিয়ে আছি ওটার দিকে। আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে প্রচ্ছদের বড় বড় অক্ষরে লেখা—

অলৌকিক নয়, লৌকিক (২য় খন্ড)

প্রবীর মিত্র

অপেক্ষা শেষ। যার জন্য এতোক্ষণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ছিলাম, তা শেষ। কেমন যেন শূন্য শূন্য লাগছে চারপাশ। তাদের কথা-বার্তা, ঠাট্টা-তামাসা অসহ্য ঠেকতে শুরু করেছে। বইয়ের পাতার ছাইয়ের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার নিজের উপর খুব রাগ হলো। শার্টের কলার অহেতুক মোচড়াতে থাকি চুপচাপ; মাথা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে অন্ধকারে ক্ষেতের জমিনে আঁকতে থাকি অহেতুক আঁকিবুঁকি। সব নিরর্থক ঠেকে আমার। একটু আগে যেগুলো আস্ত তিনটি বই ছিল, এখন তা-ই ছাই। সেই জ্বলন্ত ছাইয়ের স্তুপের দিকে তাকিয়ে থাকি একমনে; চোখের সামনে ভেসে ওঠে সরল সোজা লাইব্রেরিয়ানের মুখ! পাঠাগারের অন্ধকার কোণ... কড়কড়ে পৃষ্ঠা... নতুন কাঠের গন্ধ... হঠাৎ মনে পড়ে যায়, আমার তো পুড়বার আগে সব কটা খন্ড পড়ে ফেলার কথা ছিল! উত্তেজনায় কথাটা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন আমি এই বইগুলো কোথায় পাব? ভেতরে কী লেখা ছিল জানতেও পারলাম না! নিজের বোকামিতে ঠোঁট কাঁপতে থাকে আমার।

২০১৪

উদ্বাস্তু

প্যাসেঞ্জার শেডের নিচে, স্টিলের বেঞ্চিতে রাশেদ বসে আছে। ক্লান্ত! সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে এসেছে। তবু রিপোর্টটা আজও শেষ করা গেল না। সে হাতে ধরে রাখা ফাইলটার দিকে একবার তাকায়। আগামীকাল বসের কাছে গিয়ে কী জবাব দেবে সে? এমন তো নয় যে, তার কাজ থেমে আছে বলে রাতও থমকে থাকবে!

যে এলাকায় সে এখন বসে আছে, সে এলাকাটা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল ওর এসাইনমেন্ট। এক সকালে বস তাকে ডেকে দায়িত্ব দিলেন যে, এই এলাকাটার অতীত আর বর্তমানের মধ্যে কী কী পার্থক্য ঘটেছে, সেই সমস্ত তথ্য যেন সংগ্রহ করে। এখন তো পুরো আলো ঝলমলে এলাকা; বিদেশি ডিজাইনের সারি সারি এপার্টমেন্ট, অত্যাধুনিক মিনি-বাজার, বিশাল মসজিদ কিংবা স্থানীয় পরিষদ। অথচ মাত্র ১০ বছর আগেও এই এলাকায় ছিল শুধু মাঠ, মাঠের পাশে খাল আর মাঝে মাঝে মাটির টিলা।

আজ যখন সে এই এলাকায় প্রবেশ করে তখন বাড়িগুলোর গায়ে সকালের হলদে আর মিঠে রোদ। মেইনগেট থেকে একটু এগোলেই বাচ্চাদের যে খেলার মাঠ নজরে আসে তার কিনারেই যে অ্যাপার্টমেন্টটি তার গা বেয়ে লতানো গাছ উঠে গেছে একেবারে ছাদ অবধি; তা দেখে রাশেদের রূপকথার সেই শিমগাছের কথা মনে পড়ে যায়। তার খুব ইচ্ছে জাগে সেও এই লতানো গাছটি বেয়ে বেয়ে উঠবে। আর গিয়ে দেখবে, কোন এক রাজকুমারী চোখে-মুখে বিষণ্নতা নিয়ে রেলিঙের গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তখনই, চোখের সামনে থেকে পুরো বাড়িটা মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়; নিজেকে কল্পনা করে সেই ছাদে। গিয়ে রাজকুমারীর কাঁধে হাত রাখে আলতো করে, তারপর বলে, 'তুমি

খুব দুখী, না?' তখন সে করুণ চোখে তাকায় রাশেদের দিকে; আর বলে, 'আমাকে কেউ ভালবাসে না!'

রাস্তায় প্রাইভেটকারের আনাগোনা বেড়েই চলছে; কিন্তু গাড়ির শব্দ মানুষের কোলাহল কিছুই কানে ঢুকছে না তার। সে ধ্যান ধরে তাকিয়ে থাকে লতানো গাছওয়ালা এপার্টমেন্টের দিকে। তার চোখ চকচক করে ওঠে রাজকুমারীর কথা শুনে। হঠাৎ বাচ্চুর কথা মনে পড়ে যায়। স্মিত হেসে ভাবে, বাচ্চু! তুই একাই রাজকুমারীদের মন জয় করতে পারিস? দেখে যা একবার, পারি আমিও!

সংবিৎ ফিরে এলে দেখে, কীসের ছাদ, কীসের রাজকুমারী! দাঁড়িয়ে আছে পিচরাস্তার উপর। রোদ বাড়ছে। তেতে উঠছে পায়ের তলা।

গাছটিকে আরো ভাল করে দেখার উদ্দেশ্যে সে বাড়িটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এবার এপার্টমেন্টটিকে কোন সাধারণ বাড়ি মনে হচ্ছে না; মনে হচ্ছে রাজপ্রাসাদ। দুহাত দিয়ে কোমর আঁকড়ে ধরে, আর ঘাড় বেঁকিয়ে গাছটির শেষপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর তৃষিত চোখে বেলকনিগুলোয় রাজকুমারীকে খোঁজে।

শুকরিয়া! তার সাধটি পূর্ণ হয়। সে দেখতে পায়, সেই এপার্টমেন্ট থেকে একটা অল্পবয়সী রাজকুমারী বের হয়ে আসছে হাসিমুখে। আগ্রহভরা চোখে তাকিয়ে থাকে সে। কিন্তু মেয়েটি তার দিকে একবারও তাকায় না। বিষণ্নমনে তাই সামনে এড়িয়ে যায়; দাঁড়ায় নীল কাঁচওয়ালা এক বাড়ির সামনে, কাঁচে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে হঠাৎ মনে পড়ে যায় এসাইনমেন্টের কথা। ওহ! কাজ বাদ দিয়ে সে কীসব ছাইপাঁশ দেখে বেড়াচ্ছে!

ছাইপাঁশ! এমন করে কথা বলত ওর ক্লাস-টিচার শিপ্রা ম্যাডাম। ক্লাসে কী যে হত, পড়া শুনতে শুনতে দৃষ্টি হঠাৎ করেই হারিয়ে যেত অতীতের কোন ঘটনায়; তারপর নিজেকে আবিষ্কার করত যে, সে খুব মনোযোগ দিয়ে জানালা দিয়ে গঙ্গাফড়িঙের উড়াউড়ি দেখছে। সেই ঘোর ভাঙত ম্যাডামের চিৎকার শুনে। তিনি প্রায়ই রেগে গিয়ে বলে উঠতেন:

'বাইরে কি রূপ বাইর হইছে?'

এত ছোট এলাকা, তার আবার এত এত রোড! এই রোড সেই রোড ঘুরে ঘুরে সে যখন ৩ নাম্বার রোডের একটা ঝলমলে এপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন পড়ন্ত বিকেল। আজকে সে আবিষ্কার করে, এই বাড়ির ৩য় তলার মলিন পোশাকপরা মহিলাটা খুব অহংকারী; অহংকারী অন্যরাও। তবে অবাক কাণ্ড! পাশের মলিন চেহারার বিল্ডিংটার অধিবাসীরা আবার তেমন অহংকারী নয়। অথচ, ঝলমলে এপার্টমেন্টের এইসব অধিবাসীরা কি জানে, যে এপার্টমেন্টের ভেতরে থাকতে পারে বলে এত অহংকার দেখাচ্ছে, সেই এপার্টমেন্টের নিচে একসময় কানাই চোরার মদের ভাঙাচোরা চালান ঘর ছিল? নয়ত মাটির টিলা ছিল, যেখানে প্রতি রাতে শেয়াল কুকুর উঠে পেচ্ছাপ করে যেত! সেই চালান-ঘর অথবা মাটির টিলার উপর যে শূন্যতা ছিল, তাকে ইট-বালি আর পাথর-সিমেন্ট দিয়ে বন্দি করে দেওয়া হল; তারপর তাদের ভেতরে আর বাইরে কারুকাজ করা হলে, নাম দেয়া হল এপার্টমেন্ট।

কিন্তু সেইসব শব্দ দৃশ্য মুহূর্ত কোথায় হারিয়ে গেল? প্যাসেঞ্জার শেডের নিচে টাইলস লাগানো দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাশেদ ভাবতে চেষ্টা করে। পঞ্চাশ বছর আগে এখানে কী ছিল, সে জানে না। শুধু পানি আর পানি নাকি? সেই অথৈ পানির উপরে যে থইথই শূন্যতা, তার উপর দিয়ে অন্যান্য পাখির সাথে উড়ে যেত বালিহাঁস; ঝাঁকে ঝাঁকে। একদিন অন্যান্য দিনের মতই উড়ছিল, হঠাৎ কয়েকটা গুলির শব্দ; নিস্পন্দ! জীবিতপাখিরা দেখে, পানি শুকিয়ে চর জেগে গেছে। এখনো একি সূর্যের আলোয় এখানে দিন হয়, রাতে আকাশে দেখা দেয় সেই একি চাঁদ; অন্ধকার রাতে মাথার ওপরে আমলকী ফলের মত বিছানো থাকে অজস্র নক্ষত্র। শুধু অন্ধকারটা ভিন্ন; আগে যেখানে মাঠ খাল আর টিলার উপর মহাজাগতিক অন্ধকার জেঁকে থাকত, সেখানে এখন এপার্টমেন্টের ছায়া, বাকি খোলা অংশটুকু স্ট্রিটলাইটের আলোয় জেগে থাকে সারারাত।

সে এই এলাকার অতীতের কিছু মুহূর্ত কল্পনা করতে চেষ্টা করে। দেখতে পায়— অবোধ বালিকার বস্ত্রহীন লাশ, সর্বস্ব ছিনতাই হওয়া পথিকের ভয়ার্ত মুখ, টিলার পাশে গাঁজার আসর, মাঠে কিশোরদের চিৎকার-চেঁচামেচি, খালের পাশে ছিপ হাতে দুই যুবকের আলাপন...

রাশেদের একটা কথা ক্ষণিকেই মনে পড়ে যায়। সেই সময়ে, এককোণে যে কিছু টিনের ঘর একে অপরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের উঠিয়ে দেবার

পর গেঞ্জিপরা এক বালককে নাকি কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। খুব ভাল নাকি বাঁশি বাজাত; পিচ্চি তো বুঝে নি, তাই যারা ওদের ঘর-বাড়ি উঠিয়ে দিতে এসেছিল, আড়াল থেকে ওদের দিকে নাকি ঢিল ছুঁড়েছিল; আর সেই ঢিল গিয়ে লাগে বড় সাহেবের গায়ে।

কিন্তু, আরে— রাশেদ উত্তেজিত হয়ে ওঠে— একটা ব্যাপার কেউ কি খেয়াল করছে? এইখানে একটা রোড হতে আরেকটা রোডের দূরত্ব আর কত? হেঁটে আসলেও বড়জোর দুই মিনিট; অথচ দ্যাখো, এক রোডের অধিবাসীদের কাছে তাদের এই আশেপাশের রোডগুলো কেমন অনাত্মীয়! আর বাড়িগুলোও যেন একেকটা কফিন। তেমনি দেখতে, তেমনি শীতল আর গম্ভীর চোখ-মুখ তাদের। ঠিক ঠিক! একটা সঠিক উপমাটা উদ্ভাবন করতে পেরে রাশেদ তৃপ্তি পায়। সেই কফিন থেকে বের হওয়া মানুষগুলোও বাইরের মানুষদের সামনে কেমন মরার মত ঠাণ্ডা!

এইসব সে ভাবছিল সামনের এক এপার্টমেন্টের ২য় তলায় চোখ রেখে। চোখে শূন্য দৃষ্টি! ভাবনার ভেতর থেকে বের হয়ে আসতেই, সামনের জানালা আর তার ভেতরের মানুষদের গড়ন নড়াচড়া স্পষ্টভাবে ভেসে উঠে। ভাবনার সুর কেটে যাওয়ায় সে এবার মনোযোগ দেয় সেই জানালার দিকে। এলইডি টিভি চলছে, এক বালক সামনে, কিশোরী গোছের এক মেয়ের চোখ মোবাইলের স্ক্রিনে সাঁটা, গৃহকর্ত্রী গোছের একজন কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিজের দিকে তাকায়। মলিন শার্ট আর পুরনো প্যান্ট। আর ধুলোয় সাদা হয়ে যাওয়া জুতা। রাত কত হলো? এপার্টমেন্টের বাতিগুলো সব জ্বলে উঠেছে! বাচ্চু তো এই এলাকাতেই থাকত বলে শুনেছে, এখনো থাকে নাকি? যে বাড়িতে থাকত, সেই বাড়ির মেয়েটিকে নাকি প্রতিদিন গাঁজা সাপ্লাই দিত সে। আচ্ছা, গাঁজাই কি শুধু সাপ্লাই দিত? এতই যখন খাতির জমে গিয়েছিল, আর কিছু করে নি? কিন্তু সে বাড়িটা কত নাম্বার রোডে? হাতে ধরে রাখা ফাইলটা ব্যাগে পুরে সে উঠে দাঁড়ায়। এত এপার্টমেন্ট, তার আবার প্রতিটা এপার্টমেন্টে কত কত ফ্ল্যাট; সে কোথায় খুঁজবে বাচ্চুকে? তবুও ফ্ল্যাটগুলোর জানালায় চোখ রেখে রাশেদ সামনে আগায়।

রাশেদের হঠাৎ মনে পড়ে যায়, বাচ্চুর প্রিয় রঙ কমলা। আর প্রিয় মুহূর্ত— জানালার পর্দায় প্রায় সমস্ত শরীর জড়িয়ে, শুধু মাথাটা বের করে, বাইরে

তাকিয়ে থাকা। ওই বাসার জানালা লোহার শিক দিয়ে আটকানো যে! তাই তো বাইরে বের হওয়া যায় না। দেশের একটা কাকও আসে না, যাকে দেখে সে তার নয়ন জোড়াবে। এখন রাশেদের একটাই কাজ, একটা কমলা রঙের বাড়ি খুঁজে বের করা। একি রঙের বাড়ি একাধিক থাকতে পারে, তাকে খেয়াল রাখতে হবে যে, সেই এপার্টমেন্টের কোন জানালার একধারে চুপ করে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি-না।

তাকে বেশি কষ্ট করতে হয় না, অই তো সামনে কমলা রঙের বাড়ি আর তার নিচতলার জানালা থেকে একটা মানুষের ছায়া এসে পড়েছে একেবারে রাস্তায়। সে কাছে যেতেই ছায়াটি নিজেকে গুটিয়ে নেয় ঘরের ভেতরে। তখন বাচ্চুর কণ্ঠস্বর কানে এসে লাগে। প্রবল উত্তেজনায় সে বাম হাতে জানালার নীলপর্দার ভাঁজ একটু একটু করে ফাঁক করে। মুহূর্তে ভেতরের সমস্ত দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় চোখের সামনে; উত্তেজনায় তার হৃদকম্পন বাড়তে থাকে সশব্দে।

বাচ্চু! বাচ্চু! তার ছেলেবেলার একমাত্র বন্ধু, খেলার সাথী, ঝগড়াঝাঁটির সঙ্গী! কত শত দিন ওরা পাখির বাসা খুঁজে বেড়িয়েছে একসাথে! আর ওর বাপ বলে কিনা ও মারা গেছে, যে বাসায় থাকত, ওরাই নাকি কী এক মেয়েলি ব্যাপার নিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে ওকে। অথচ এইতো, এই যে জলজ্যান্ত মানুষটা।

মৃদু আলো ভেতরে। সে দেখতে পায়, বাচ্চু এক কিশোরী রাজকুমারীর মুখ দুই হাতে এত সাবধানে ধরে আছে, যেন একটু এদিক সেদিক হলেই হাতের ফুটো গলে জল হয়ে ঝরে পড়বে মেয়েটি। বাচ্চুর চোখে-মুখে সুখী স্মিত হাসি। হঠাৎ কী মনে করে জানালার দিকে তাকায়; আর সাথে সাথে রাশেদের চোখে চোখ পড়ে যায় তার। সেই একি স্মিত হাসির ঢেউ খেলানো ঠোঁটে বলে ওঠে, 'আরে, তুই বাইরে ক্যান? ভেতরে আয়। জানালার পাশেই দ্যাখ ঘুলঘুলি আছে। ওটা দিয়ে ঢোক!'

রাজকুমারীকে দেখে রাশেদের প্রবল ঈর্ষা জাগে। সে সরাসরি তাকায় বাচ্চুর দিকে, তারপর শ্লেষমাখা গলায় জানতে চায়, 'তুই নাকি মারা গেছস?'

বাচ্চু এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না। সে রাজকুমারীকে ছেড়ে ছুটে যায় জানালার কাছে। গিয়ে দুইদিকে প্রসারিত করে জানালার গায়ে হাতদুটি রাখে। তারপর

মাথাটা জানালার শিকে ঠেকিয়ে বাইরে তাকায়। আর রাজকুমারীর উদ্দেশ্যে বলে:

'খেয়াল করছ তুমি? বাইরেও শূন্য, তোমাদের ঘরের ভেতরেও শূন্য! কিন্তু এইখানের শূন্যতাকে দেয়াল দিয়া আটকাইয়া রাখছ, যাতে নিজেদের মতন করে চলতে পার সেই শূন্যতাটুকুর ভিতরে।'

রাজকুমারী যেন কিছুই শুনতে পায় নি এমন চোখে রাশেদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর মিষ্টি গলায় জানতে চায় যে, তার এসাইনমেন্ট কতদূর? আহ, কী স্নিগ্ধ যে লাগে মেয়েটিকে! কিন্তু রাশেদ অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করে, এইতো সেই রাজকুমারী, যাকে সকালে সে লতানো গাছওয়ালা এপার্টমেন্টের ভেতর থেকে বের হতে দেখেছে। তার খুব অভিমান জাগে।

— তুমি তখন কথা বললে না কেন?

— এটা যে আমাদের আসল বাড়ি না! আমরা তো এখানে আগন্তুক।

— তবে?

— দাদার বাড়ি গ্রামে; কিন্তু বাড়িটা এখন নদীর ত্রিশ হাত নিচে!

বাইরে গাড়ির শব্দে বাচ্চু সচকিত হয়ে উঠে। ধীরে আর কাঁপা হাতে জানালা ঢেকে দেয় পর্দা দিয়ে। কী এক মহাজাগতিক ভয় ওর চোখে-মুখে আছড়ে পড়ে। ছুটে আসে রাশেদের কাছে; দ্রুত আর ফিসফিস করে বলে, 'তাত্তারি আয়! দেখলে ওরা পিটাইয়া মাইরা ফেলব!' বলেই রাশেদের হাত ধরে সে হেঁচকা টান মারে। তারপর সে একাই সেই ঘুলঘুলি গলিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

চলে যাবার মুহূর্তে রাশেদ একবার রাজকুমারীর কাছ থেকে বিদায় নেবার তাগিদ অনুভব করে। তাই হাসিমুখে তার মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু মেয়েটির চোখে-মুখে কোন আন্তরিকতা বা পূর্ব-পরিচয়ের চিহ্ন লেশমাত্র খুঁজে পায় না। বহুদূরের, অপরিচিত কোন আগন্তুকের মত লাগে।

রাস্তায় নেমে দেখে, সমস্ত পথ-ঘাট বৃষ্টিতে ভেজা। অন্ধকার, শুধু নক্ষত্রের আবছা মতো আলো। সেই আলোয় দেখতে পায়— রাস্তায় অসংখ্য মানুষ; বউ-

বাচ্চা নিয়ে গৃহকর্তারা কোথায় যেন ছুটছে। কাঁধে আর মাথায় ব্যাগ। বুড়োগুলো ধীরে হাঁটছে। ফ্ল্যাট খালি করে এরা সব ছুটছে কোথায়? কারোর মুখেই কোন কথা নেই, শুধু পায়ের শব্দ চারপাশে। প্রতিটা এপার্টমেন্টের প্রায় সবগুলো ফ্ল্যাট অন্ধকার; শুধু সবার উপরের তলায় মৃদু আলো। এত এত মানুষের ভিড়ে রাশেদ দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে, একা একা; ৮টায় অফিস, উঠতে হবে ভোরে।

এই রোড সেই রোড হেঁটে হেঁটে সে যে রোডে গিয়ে পৌঁছায়, সেটা হলুদ আলোয় আলোকিত। তার দৃষ্টি চলে যায় রাস্তার মাঝখানের এক বাড়ির সিঁড়িতে; এক ছেলে ডান পা উপরে তুলে বসে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে, গায়ে সুতির গেঞ্জি, প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। সামনেই একটা বিড়াল, গভীর আগ্রহে ছেলেটির বাঁশি বাজানো শুনছে। আর এই দৃশ্য দেখে রাশেদ থমকে দাঁড়ায়; কোথায় যেন দেখেছে দৃশ্যটা, কোথায় দেখেছে? তার খুব ইচ্ছা জাগে, গিয়ে ছেলেটাকে সে জিজ্ঞেস করে, সে তার পরিচিত কিনা। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হয় না; তাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে ছেলেটিই বাঁশি বাজানো থামিয়ে দেয়, তারপর মিনতিমাখা গলায় বলে উঠে, 'আমি যে এইখানে বসে বসে বাঁশি বাজাই, কাউরে বলবেন না কিন্তু? এইখানে আগে আমগো বাড়ি আছিল।'

ছেলেটির জন্য রাশেদের করুণা জাগে। কতদিন পর দেখা! এইসব ফ্ল্যাট হবার আগে এইখানে সে কত খেলাধুলা করেছে বন্ধুদের সাথে! আর বাঁশি বাজিয়েছে। স্নেহমাখা গলায় রাশেদ জানতে চায় যে, তারা এখন কোথায় থাকে। মাথায় হাত বোলানোর উদ্দেশ্যে সে সামনে আগায়। কিন্তু ছেলেটি হঠাৎ ভয় পেয়ে ওঠে দাঁড়ায়, হাত থেকে পড়ে যায় বাঁশি। বিড়ালটি ভয় পেয়ে ছুটে পালায়। ছেলেটি অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে নখ চুলকায় আর ডানপায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে অদৃশ্য আঁকিবুঁকি খেলে।

রাশেদ বিব্রত হয়ে পেছনে ফিরে, তারপর সামনে আগায়। মোড় নেওয়ার সময় ছেলেটির ক্ষোভমাখা আত্মকথন তার কানে এসে ঠেকে। 'বিড়ালটারে কী সুন্দর কইরা বাঁশি শুনাইতেছিলাম, কী ক্ষতি করছিলাম তারে? খেলাধুলা সব যে ভাইঙা দিয়া গেল?'

গোলকধাঁধার মত এ-গলি ও-গলি ঘুরে ঘুরে সে এক পার্কের সামনে এসে থামে। পার্কের মাঝখানে পুকুর। টলমল পানি দেখে প্রচণ্ড পিপাসা পায় রাশেদের। সে ছুটে নামে পুকুর ঘাটে, অঞ্জলি ভরে পানিটুকু মুখে দিতে যায় আর তখনি শুনতে পায় ঘাটের একপ্রান্ত থেকে দুই যুবক ওকে ডাকছে।

‘আরে ভাই! পানি নাড়াইলেন ক্যান, বড়শি দিয়ে মাছ ধরতাছি। চোখে দেখেন না নাকি?’

তৃষ্ণা নিয়েই কাঁপা কাঁপা পায়ে হাঁটতে থাকে। সেই এলাকা ছেড়ে এখন যে কোন এলাকায়, তার ঠিক ঠাহরে আসছে না। চোখের সামনে শুধু দেখতে পায় উঁচু উঁচু এপার্টমেন্টের জায়গায় দুচালা টিনের ঘর। এলোমেলো ছড়ানো-ছিটানো। ঘরগুলোর জানালা থেকে কুপির আলো রাস্তায় এসে পড়ছে। আলো মোরগ ফুলের মত টকটকে লাল। এক বাড়ির ভেতরে দেখতে পায় এক মা চুলোর সামনে, বিষণ্নমনে চুলোর আগুনের দিকে তাকিয়ে। চুলোয় হাঁড়িতে পানি টগবগ কর ফুটছে। তাকে ঘিরে তার চারটি সন্তান। পেট চাপড়ে বসে আছে।

— মা, বাদশা হারুন-অর-রশিদ নামে কেউ কি সত্যি সত্যিই ছিল কোনদিন?

— তোদের বাপই বাদশা হারুন। একটু খাড়া, এইতো চাল নিয়ে আসব।

— তাহলে শুধু শুধু পানি ফুটিয়ে লাভ কি? সেই পানিতে যদি চালই না থাকে!

হাঁড়িতে পানি দেখে রাশেদের তৃষ্ণা আরো বাড়ে। সেই লাল আলো মাড়িয়ে সামনে আগায় সে।

রাশেদ তার ঘরের সামনে যখন পৌঁছায়, ভেতর থেকে পরিচিত কয়েকটা কণ্ঠস্বর কানে এসে লাগে। গ্রিলবিহীন জানালা গলে ভেতরে ঢোকে সে। দেখে তার ভাইগুলো খাটের উপর শুয়ে থেকে গল্প করছে; বাচ্চু রেলিঙে হেলান দিয়ে একমনে কী ভাবছে। আর ঠিক তখনই বাইরে পুনরায় গাড়ির শব্দ শুনতে পায় তারা। গাড়ির শব্দটা রাশেদের বসের। তবে কি বস ওর বাসাতেই এসে পড়লেন? কাঁপা কাঁপা হাতে বাতি নিভিয়ে দিয়ে বাচ্চু একলাফে বিছানায় গিয়ে উঠে। আর রাশেদকে চোখের পলকে শুয়ে পড়তে বলে। সে তার কথা অমান্য করার সাহস পায় না। মশারির একপ্রান্ত উঁচিয়ে বিছানায় ঢোকে। বাচ্চু আবার ফিসফিস করে উঠে, ‘চোখ বন্ধ কইরা থাক, যাতে ট্যার না পায় আমরা জাইগা আছি।’

কিন্তু রাশেদ চোখ বন্ধ করার সাহস পায় না। ওপরে চোখ পড়তেই দেখে মশা আর মশা; মশারির ভেতরে, তাদের মাথার ওপরে যেন কয়েক লক্ষ মশা!

এই মশার ভেতরে ঘুমাতে পারবে কিনা এই নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায়। কাল ৮টাই আবার অফিস, খুব ভোরে উঠতে হবে তাকে।

খোলা জানালা দিয়ে আসা জোরালো বাতাস মশারির গায়ে আছড়ে পড়লে রাশেদ অনুভব করে, নিজের মেসের বিছানায় শুয়ে আছে সে, একা। চারপাশ কী চুপচাপ! পানিতে প্রায় হাঁটুপর্যন্ত প্যান্ট ভেজা। ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। তার এসাইনমেন্টের কথা পলকে মনে পড়ে যায়। কাল ঠিক ঠিক মতো কাজ বুঝিয়ে দিতে না পারলে, বেতনটা আটকে যেতে পারে সপ্তাহখানেকের জন্য; চাকরিও চলে যেতে পারে। মেসভাড়া বাকি, দোকানে বাকি। মৃত্যুশীতল স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে যে ফ্ল্যাটবাসীরা উদ্বাস্তুর মতো হাঁটছিল, নিজেকে তাদের অনুগামী বলে মনে হয় রাশেদের। গভীর ঘুম গ্রাস করে তাকে, তখন মনে হতে থাকে— কালো এক শূন্য মহাগহ্বরে যেন ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে সে।

এপ্রিল, ২০১৬

প্রতিবিম্ব

চারটি দেয়ালজুড়ে এনার্জি বাল্বের ধবধবে সাদা আলো; পুরো রুমজুড়ে গ্রাঢ় নীরবতা। বালিশের উপর মাথা রেখে অনন্ত ঘুমের তলে লুকিয়ে পড়বার আগেই, সে পবিত্র গ্রন্থটার যতগুলো পৃষ্ঠা পারে, পড়ে নিতে চায়। নিজের বুকের ধুকধুকানি স্পষ্ট কানে শুনতে পাচ্ছে, ভয়ে পড়া আর বেশি দূর এগোয় না, সত্যি যদি মরে যায় তখন কী হবে? সে কি এই মৃত্যুই চেয়েছিল? মনে তো হয় না— 'ডাস্টবানের' অতি তিতে আর গন্ধে ভরা সামান্য তরলটুকু গ্লাসের আধেক পানিতে মিশিয়ে এক চুমুকে খেয়ে নিয়েছিল, এরপরেই মনে হতে থাকে, নাহ, কাজটা বোধহয় ঠিক হল না! অলৌলিক প্রতিভা লাভের অন্য আরো পন্থা থাকতে পারে, কিন্তু মরে গিয়ে যদি দেখে পরকাল বলে কিছু নেই, তাহলে তো সেখানে শেকসপিয়ার রবীন্দ্রনাথ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি কিংবা মাইকেল এঞ্জেলোদের অস্তিত্ব থাকার কোন প্রশ্নই আসে না। যদি আগামিকাল সকালে তার ঘুম ভাঙ্গে আর দেখতে পায়, সে বেঁচে আছে, তাহলে মাথা থেকে সবার আগে এইসব ভূত নামাবে সে। বেঁচে থাকা দিয়ে কথা!

বাতি নিভিয়ে দেবার সাথে সাথে প্রগাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায় রুমের সাদা দেয়াল, পেপার বিছানো টেবিল, বাহারি ফুলের বেড- শিট কিংবা মাথার ওপরের ফুলতোলা কাগজের সিলিং। সেই অন্ধকারকে ক্যানভাস ভেবে, চাইলেই মনে মনে অনেক ছবি কিন্তু আঁকা যায়। শুধু অন্ধকারে কেন, ওদের বাড়ির পেছনে ঠান্ডা আর ছায়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন যে বাঁশঝাড় আছে, সেখানে ও এমন কত ছবি এঁকেছে ওর ছোটবেলায়! ছায়ায় ভেজা নরম মাটির ওপর কঞ্চির চোখা আগায় ঘর আঁকত সে, তাদের ভাঙ্গা- চোরা অথর্ব বুড়োর মত টিনের ঘর নয়, সে আঁকত রঙিন টিনের কানটুপি মাথায় তে- কোণা বিল্ডিং, তার লাগোয়া বারান্দা, সামনে আবার হরেক রকম ফুলের বাগান। তবে, মোটরওয়ালা লাল গাড়ির ছবি সে কখনো এঁকেছে কিনা, তার ঠিক খেয়াল হচ্ছে না; পাশের বাড়ির ছেলেটি যখন হাঁটু- পর্যন্ত লম্বা নীল রঙের সুন্দর একটা ইংলিশ প্যান্ট পরে সেই গাড়ি চালাত, সে কী আকুল চোখেই না তাকিয়ে থাকত— আর ভাবত, ইশ! ওমন একটা গাড়ি যদি শুধুই তার থাকত! ব্যাটারি লাগিয়ে চাবি ঘুরালেই গাড়ির মাথায় কেমন লাল লাল বাতি জ্বলে ওঠে আর কী

সুন্দর ঝিঝিঝি শব্দ তুলে সমানে গড়িয়ে চলে বাঁধানো মেঝের ওপর দিয়ে! আর ওই ছেলের যে মেশিনওয়ালা একটা লঞ্চ ছিল, যেটাতে কেরোসিন তুলে আগুন ধরিয়ে দিলেই বোঁ বোঁ শব্দ তুলে পানির ওপর দিয়ে ধা করে ছুটে যেত, তার ছবি সে মাটিতে কখনো আঁকে নি; শুয়ে পড়ার শেষে বাতি নেভানোর পর ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে, কল্পনায় ওর চোখের সামনে ফুটে ওঠত অপার্থিব দিনের আলো— সেই আলোয় খয়েরি রঙের লঞ্চটা ভেসে ওঠত। আর, ঝিঁঝি পোকার একটানা ডাক, শিশির পড়ার শব্দ অথবা বাড়ি ফেরার পথে, শেষ হাটুরের দরদ ভরা গলায় গাওয়া যে অপার্থিব সুর দূরের রাস্তা থেকে ভেসে আসত, তার সমান্তরালে সেই লঞ্চের বোঁ বোঁ শব্দের টান মিশে একাকার হয়ে যেত। কোন কোন দিন আবার, অন্ধকারে সুদূরে ঝুলে থেকে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকত ছেলেটির রুমে লটকানো এক মহিলার সেই পেইন্টিংটা। আজ আবার, বহুকাল আগের এইসব শব্দ দৃশ্য মনে করতে চেষ্টা করে, শব্দ শোনার আশায় কান পেতে থাকে— অস্পষ্ট কানে রাত্রির অতল গভীর অতীত অন্ধকার থেকে তখন শব্দগুলো কোলাহল হয়ে ফিরে ওঠে আসছে বলে মনে হতে থাকে তার। সেইসব কোলাহল শুনতে শুনতে তার কেমন ঘুম পায়। কিন্তু এখন ঘুমিয়ে পড়াটা কি ঠিক হবে? ভয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য নাহয় ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু একবার ঘুমিয়ে গেলে, তারপর যদি সকালে আর জেগে না- ওঠে?

নরম বিছানায় আস্ত শরীর এলিয়ে দেয়। চারপাশের যে ছোট ছোট স্পর্শ, দৃশ্য, শব্দ, ঘ্রাণ— সে এতোদিন এড়িয়ে গেছে, বিছানা আর বালিশের কোমল আদুরে আতিথেয়তায় তারা আজ এই রাতে তার অনুভূতিতে এসে ধাক্কা মারে। তার এক ভোর সকালের কথা মনে পড়ে যায়। সেই ভোরে পাশের বাসার নীল ইংলিশ- প্যান্ট পরুয়া ছেলেটি ওরই অপেক্ষায় তাদের উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল; তার হাতে ধরে রাখা একটা চারকোণা রঙিন পোস্টার। পোস্টারে লাল কাঁকর বিছানো পথে দাঁড়িয়ে এক তরুণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূরের অন্ধকারাচ্ছ বাড়ি- ঘরের দিকে। হাতে ধরে আছে সোলেমানি তলোয়ার, মাথায় সোনালি ফিতে বাঁধা, কাঁধের উপর বসা কথা- বলা- টিয়ে। তার পেছনে, অনেক দূরে, দিগন্তে, হলুদ পাহাড়ের ওপারে ডুবে যাওয়া সূর্যের উজ্জ্বল আভা। আর মাথার ওপরে অজস্র নীলচে সান্ধ্য নক্ষত্র, নক্ষত্রের নিচ দিয়ে দিগন্তের দিকে উড়ে যাচ্ছে সবুজাভ বিচ্ছুর দল। আকাশের রং কালচে সবুজ। সেই ভোরে তার ঘুম ভাঙা চোখ আটকে যায় পোস্টারে । তখন ছেলেটি বাম হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে, ডান হাতে উঁচিয়ে ধরে রাখা পোস্টারের দিকে ভ্রু নাচায়। তারপর চোখ- মুখ কুঁচকিয়ে ঘোষণা দেয়, 'দুনিয়ার এমন কোনো কাম নাই, এই লোকটা না- পারে! কেমনে জানো? ঐ তরোয়াল দিয়া। আল্লায় তারে এই তরোয়াল নিজে দিছে। আর ঐ যে টিয়া পাখি, কোনো বিপদ হবার আগেই ওরে কইয়া দেয়। সবসময় কান্দে চইড়া থাকে। শোন, তোমার মুছলমানির

মইদ্যে আল্লারে দাওয়াত দিও। তাইলে, আল্লা তোমারে এই রহম একটা সোলেমানি তরোয়াল দিতে পারে...' ছেলেটির কথা শুনতে শুনতে খুশিতে ওর নাক আর ঠোঁট তিরতির করে কাঁপতে থাকে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে— যে করেই হোক, তাকে সোলেমানি তরবারি পেতেই হবে। এখন থেকে তাহলে নিয়মিত নামাজ পড়াটা খুবই দরকার; আল্লা একবার ওর প্রতি রাজি- খুশি হলেই তাকে অলৌকিক শক্তি দিয়ে দিবে। তখন সে নিজেকে অদৃশ্য করে দুনিয়ার যেকোন জায়গায় চাইলেই চলে যেতে পারবে মাত্র এক মুহূর্তে। কী যে মজা হবে! আর তখন যে তার সাথে লাগতে আসবে, আসুক— জনমের তরে তার থুতনি ভেঙ্গে দেবে ও, অনেক সহ্য করেছে এতোদিন, আর না; তারপর, ধরা যাক, কাউকে অজগর সাপে দৌড় লাগাল, তখন ও সোলেমানি তরবারি দিয়ে সাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, হু, তারপর সবাইকে চমকে দিয়ে তরবারিটা শুধু সাপের দিকে তাক করা সই, ওমনি জাদুর আলোতে সাপ কেটে একেবারে দুই ভাগ! ভয়ের কিছু নেই, তখন তো হাতে থাকবে সোলেমানি তরবারি, আর অলৌকিক শক্তি; জাদুর সেই শক্তি দিয়ে সে কী করতে চায়, সবই করা সম্ভব। পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর মেয়েটি তখন ওর, আহ— সবাই কেমন তাক লাগে যাবে, ঈর্ষা করবে তাকে। আর, ওর খুব অনুগত বন্ধু টিয়ে পাখিটা তো থাকবেই— ওর নানির বাড়ির কোন বটগাছে নাকি টিয়ে পাখির খোড়ল আছে, খোঁজ তো তাহলে নিতেই হয়! কাউকে এইসব আগে- ভাগে কিছুই বলা যাবে না। তারা কল্পনাও করতে পারবে না সে কী জিনিস পেতে যাচ্ছে...

প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ছুটে যায় দুই চোখ থেকে। এই যাহ— নোটবুক? ওর হলুদ নোটবুক! নোটবুকটা তো পোড়া হয় নি! মনের গভীর গহীনে যত ভাবনা ছিল, সব তো ওটার ভেতরেই রয়ে গেছে; — এখন? শুধু তো লেখা না, যখন যে মেয়েকে নিয়ে কল্পনায় ও মেতে থেকেছে, তাদের ছবিও যে আঁকা আছে অনেক। তারপর, ও যেসমস্ত মেয়েকে একান্ত আপন করে পাশে চেয়েছে, রাতের পর রাত রাস্তায় হাঁটার সময় ওদের নিয়ে স্বপ্ন বুনেছে, উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে এসে যারা মাথায় সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে— তাদের নাহয় যত্ন করে সুন্দর সুন্দর কাপড়সহ এঁকেছে; মার্কার পেন দিয়ে আবার রঙের প্রলেপও দিয়ে দিয়েছে কারুকার্যময় পোশাকে; কিন্তু যাদেরকে সে শুধুই উত্তেজিত মুহূর্তে পেতে চেয়েছে, ম্যাগাজিনের রঙ্গিন পৃষ্ঠা ছেড়ে অথবা টিভির পর্দা ফুঁড়ে লেপের উষ্ণতায় তার শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ের পড়েছে, তাদের একটারও গায়ে তো সুতো পর্যন্ত নেই! ধুর— না থাকুক; তার মৃত্যুর পর সবাই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্ত করলেই তার কী, আর আস্ত নোটবুকটা মুদির দোকানে বিক্রি করে দিলেই বা কী? এটা সত্য যে, এই নোটবুকটি খুলে

তার সবচেয়ে কাছের বন্ধুটিকেও কখনো দেখায় নি, শুধু বলেছে, তার একটা নোটবুক আছে। এইসব কী কাউকে দেখানো যায়?

আবার দুচোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসে। বিষের ক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে নাকি? এই অন্ধকারেও দেয়ালে ওসব কী লটকানো? এইত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! আরেহ, বদ মেয়েগুলোর কান্ড- কারখানাটা একবার দ্যাখো! সে চিন্তায় অস্থির যে, কেউ যদি নোটবুকটার খোঁজ একবার পায়, তাহলে সে কীসব আজেবাজে জিনিস এঁকে গেছে— সবটা মানুষ জেনে যাবে, আর এদিকে এই মেয়েগুলো নিজে থেকেই কেমন ঝুলে আছে নোনা- ধরা দেয়ালে! এখন আর কী! এখন তো অন্ধকার! সকাল হলেই সবাই যখন এই ঘরে আসবে, তখন পয়লাতেই তো তাদের চোখ চলে যাবে দেয়ালের স্কেচগুলোর দিকে। নোটবুকের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসে দেয়ালে ঝুলে পড়ার আগে এইসব বেহায়াদের একবার কি ভাবা উচিৎ ছিল না যে, তাদেরকে এত যত্ন করে যে মানুষটা সারাজীবন ধরে এঁকে গেল, সে যখন আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই হয়ত বা নাই হয়ে যাবে, তখন তাদের ওমন করে দেয়ালে লটকানো অবস্থায় মানুষ- জন যদি দেখে, লোকেরা কী ভাবতে পারে এই মানুষটার সম্বন্ধে?

নাহ, কিছুতেই ঘুমানো যাবে না। সে বন্ধ জানালা খুলে দেয়, বাইরের আবছা আলোয় মেলে ধরে নোটবুকটার প্রথম পৃষ্ঠা। জানালা গলে চুয়ে চুয়ে আসা আলো কুয়াশার সাথে আছড়ে পড়ছে নোটবুকটির ওপর; সে সেই আলোয় একটার পর একটা পৃষ্ঠা ওলটাতে থাকে। আর তখনি, সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে যায় এক মুহূর্তে। তবুও কী আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ বা শেকসপিয়ার কিংবা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিদের প্রতি একটুও ক্ষোভ জাগে না তার— সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে নোটবুকটার ওপরে। তখন জন্ডিসে ভোগা কুকুরের পেচ্ছাপের মত হলদেটে নোটবুকের কভারের রং চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আগুনে আত্মাহুতি দেওয়াই ছিল যার কপালের নিয়তি, সেখানে তার কী করার আছে?

নোটবুকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যত শব্দ আর স্কেচ, সমস্তটাতে সে বুঁদ হয়ে যায় মুহূর্তেই। ঘরের উপরেই কাঁঠাল গাছ, তার পাশেই লেবু আর জাম্বুরা গাছ পাশাপাশি; বাইরে তাদের পাতা চুয়ে চুয়ে শিশির পড়ার টুপ টুপ শব্দ। নাম-না- জানা একটা পাখি একটানা ডেকেই যাচ্ছে, তার শৈশবে মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলেই এই পাখির ডাক খুব ধ্যান ধরে শুনত সে। এই সব শব্দ ভেদ করে কাদের যেন হাসাহাসির শব্দ ওর কানের ওপর আছড়ে পড়ে। শব্দটা কোথা থেকে আসছে তা জানার আশায় বাইরে বেরোয় ব্যাকুল হয়ে। আরে, বাইরে তো দেখি দিনের মত ফুটফুটে আলো। বাইরে এমন উৎসব রেখে ঘরের ভেতরে শুয়ে শুয়ে এতোক্ষণ কীসের ছাতার মাথা করছিল সে! উচ্ছ্বসিত চোখে ও সামনে তাকায়; অরুণদের বাড়ির সামনেই সেই ঝটলা, কীসের জন্য এত আওয়াজ ওখানে? ও নিঃসংকোচে সামনে এগোয়।

ভাল করে কিছু বোঝার আগেই, উৎসবের ভেতর ও ঢুকে পড়ে। সালিম ভাই বলে, কাছে আয়। কে যেন ট্রাকের উপর ওকে উঠিয়ে দেয়। ওর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এত এত ঝিকঝিকে রূপালি নক্ষত্র। আচ্ছা, সব নক্ষত্র নামিয়ে আনলে আকাশ খালি হয়ে যাবে না তো আবার? প্রতিদিন ঘুমুবার সময় জানালা দিয়ে সে শিশিরে ভেজা চোখে আকুল হয়ে তাকিয়ে থাকে এইসব রূপালি নক্ষত্রের দিকে— ইশ, কেউ যদি একটা পেড়ে দিত তাকে! আর দ্যাখো এইবার, সেই নক্ষত্রই এখন ট্রাকের উপরে ওর চারপাশে গড়াগড়ি খাচ্ছে! পাশ ফিরে দেখে ওর মামা আর আপাও দাঁড়িয়ে। চোখে চোখ পড়ে যায় মামার সাথে ওর। মামা কানের কাছে মুখ এনে বলে, শালিক পাখির ডিম চাইছিলা না? যাও, আপার কাছে রাইখা দিছি।

এক ছুট্টে চলে আসে রান্নাঘরে। তাকে দেখামাত্র মা গনগনে চুলার দিকে চোখ রেখেই কোলের ভেতর আন্দাজে হাতড়ায়। তারপর বের করে আনে তিনটা ডিম। এত বড় বড়, দুই হাত দিয়েও বেড় পায় না; ডিমের খোলসের রং আকাশি নীল— সেই নীলের ওপর আকাশের গায়ে গেঁথে থাকা রূপালি নক্ষত্রের মত সাদা সাদা অজস্র ফোটা। মা'র কানের কাছে মুখ এনে জানতে চায়, ডিমের খোলসের গায়ে এই যে এত এত তারা ফুটে আছে, এগুলো তুলে আনবে কী দিয়ে।

মা নিশ্চিন্ত গলায় উত্তর দেয়, 'ডালার মইদ্যে গিয়া দ্যাখ খেতা আছে, খেতার মইদ্যে সুঁই!' সুঁই নিয়ে ফিরে এসে দেখে প্রায় ভোর হয়ে গেছে। তখন, রান্নাঘরের দরজায় নীল ইংলিশ প্যান্ট পরা ছোটনের মুখ ভেসে ওঠে, হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকে ছোটন, হাতে একটা রঙিন পোস্টার; বিরক্তিভরা চোখে সে ছোটনের দিকে তাকায়— শালা আসার আর সময় পেল না। মনে মনে গজগজ করতে করতে ও উঠোনে চলে আসে। ডিমগুলোর জন্য কান্না চলে আসে ওর— এই ডিমগুলো কি সারাজীবনে পাওয়া হবে আর? কক্ষণো না, কোনদিন না।

পোস্টারটা ওর হাতে দিয়ে ছোটন উত্তেজিত গলায় বলে, 'তোমারে দিয়া দিলাম।' তারপর ওর কাঁধে হাত রেখে খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে জানায়, 'তোমারে টিয়া পাখির বাসা দেখাইতে চাইছিলাম না? আও আমার সঙ্গে!'

উঠান পেরোলেই বাঁশঝাড়। সেই বাঁশঝাড়ের নরম ভেজা মাটিতে কাল দুপুরে আঁকা ঘর- বাড়ি- বাগান পা দিয়ে মাড়িয়ে ছোটনের পেছনে পেছনে ছোটে সামনের ছোট্ট বটগাছটার দিকে। বটগাছের মগডালের দিকে আঙুল উঁচিয়ে গর্ত দেখায় ছোটন, বলে, 'ঐ যে ঐখানে!' ও দেখতে পায়, গর্তের ভেতরে পাখার নীল ফইড় ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এমন টিয়ে পাখি ও কত খুঁজেছে, পায় নি। অথচ ওদের বাড়ির পেছনের এই বটগাছটাতেই যে তার বাসা, সে কেন যে এতোদিন জানে নি!

তাকে ছোটন বাঁশঝাড়ের মাঝখানে রেখে 'তুমি এইখানে থাক, আমি এক দৌড়ে আইতেছি' বলে ওদের বাড়ির দিকের পথ ধরে। সে খুব স্বস্তি বোধ করে। বটগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আয়েশ করে বসে। তার খুব খুশি লাগে যে, পোস্টারটার মালিক এখন সে নিজে, এটা ভেবে। নীলচে তারায় ছাওয়া কালচে সবুজ আকাশের নিচে কী চমৎকার সবুজাভ বিচ্ছুরা উড়ে যাচ্ছে; বিচ্ছুরাও বুঝি উড়ে! ঘনায়মান সন্ধ্যার সবুজাভ আলোয় সুলেমানি তলোয়ার হাতে যে যুবক দাঁড়িয়ে, তার পেছনের হলদে পাহাড়গুলো বেয়ে বেয়ে উঠতে পারলে, কী মজা যে হত! এজন্য দরকার অলৌকিক শক্তিধর এই যুবকটির মুখোমুখি হওয়া— গিয়ে বলবে, আপনার তরবারিটা দ্যান প্লিজ! আর ঐ পাখিটাও।

সে হঠাৎ আবিষ্কার করে, বাঁশঝাড় বটগাছ ভোর ওদের বাড়ি— কোথায় মিলিয়ে গেছে! এখন সে দাঁড়িয়ে আছে লাল কাঁকড় বিছানো পথে। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে মাথায় সোনালি ফিতে বাঁধা তরুণ, হাতে সোলেমানি তরবারি, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কাঁকর পিছানো পথ যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেই অন্ধকারাচ্ছ বাড়িটির দিকে। যেন এতোদিন কোন বদ্ধ ঘরে বন্দী ছিল সে, তারপর হঠাৎ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বিশাল এক খোলা প্রান্তরে; সেখানে আছে জাদুর তরবারি, মুখ ফুটে বলার আগেই মনের সমস্ত কথা বুঝে ফেলে এমন টিয়ে পাখি। তার চারপাশে তাকিয়ে দেখে, তার সামান্য ছায়াও পড়ে নাই, ব্যাপারটা নিশ্চিত হবার জন্য পাহাড় আর গাছ-গাছালির দিকে তাকায়। উত্তেজনা আর আনন্দে সে কী করবে, সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ছুটে যায় তরুণটির কাছে; উত্তেজিত গলায় বলে, 'দেখেন আমার ছায়া একটুও পড়ে নাই!' তরুণটা ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে তাকায়, কোনো উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ পর ধীর আর অন্যমনস্ক গলায় বলে ওঠে, 'সব ছায়া ঐ বাড়িটা চুরি করে নিয়ে গেছে!'

সে এবার পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে বাড়িটার দিকে তাকায়; বাড়ির জানালায় এক কিশোরীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ, আবছা ছায়ার কারণে সে মুখ স্পষ্ট বোঝা যায় না। তার খুব ইচ্ছে করে এক দৌড়ে জানালার কাছে ছুটে যায়। তরুণটি সহানুভূতিমাখা চোখে তাকায় ওর দিকে, বলে, 'ওটা কমলা রঙের ছায়া, তুমি তো চামড়ার মানুষ! ওর কাছে যেতে হলে তোমাকে চামড়ার ভেতর থেকে বের হতে হবে সবার আগে, আর মৃত্যুই পারে তোমাকে চামড়ার ভেতর থেকে বের করে আনতে।' কমলা ছায়াটির কাছে ও এই জীবনে কখনো পৌঁচ্ছতে পারবে না ভেবে ওর মন ভারি খারাপ হয়ে যায়। অথচ, কোন এক হলুদ ছায়ার কিশোর

কিন্তু ঠিকই হয়ত ওর ঘর দখল করে বসে আছে; সন্ধ্যা নামলেই কমলা আর হলুদ দুই ছায়া বসে বসে গায়ের ঘ্রাণ নেবে মুখোমুখি। তারপর...

সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তরুণের দিকে তাকায়। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'আপনে একটা ভন্ড! আপনার জন্যই আমি ছবির ভেতরে ঢুকে পড়েছি, আপনি আসলে কোন ছাতার মাথাই পারেন না।' তরুণটির ঠোঁটে নীরব এক বাঁকা হাসি খেলে যায়। বাঁকা ঠোঁটেই বিষন্ন গলায় উত্তর দেয়, 'আমার কী করার আছে? তুমিই তো জন্মেছ চামড়ার দেহ নিয়ে!'

সে অন্ধকারাচ্ছ বাড়িটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আবছা অন্ধকারে ঢাকা, তবুও যেন স্পষ্ট দেখতে পায়— রঙিন টিনের কানটুপি মাথায় তে- কোণা বিল্ডিং, লাগোয়া বারান্দা, সামনে হরেক রকম ফুলের বাগান। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে বাড়িটি মাত্র কয়েক মুহূর্তের হাঁটা- পথ, অথচ মনে হচ্ছে যেন কয়েক শত ক্রোশ দূরের; — এক জীবন হেঁটেও যেন ও সেখানে পৌঁচ্ছতে পারবে না। ওর বিষন্ন চোখের দিকে তাকিয়ে তরুণটি এবার ক্ষোভের সাথে বলে যে, চামড়ার মানবীরা যখন স্কুল- বারান্দায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর সাথে চাপা উচ্ছ্বসিত গলায় কথা বলত, তখন ওদের সেইসব উচ্ছ্বাসকে সে মাটিতে পড়তে দিল কেন। সাথে কি হাত ছিল না তার? এই অভিযোগে সে চিন্তায় পড়ে যায়; ছায়া- মানবীর কাছে যা পাবার জন্য এতকাল ছুটে আসছে, চামড়া- মানবীর কাছে কি তা পেত না? পেত, অবশ্যই পেত। কিন্তু শরীর জাগা আর মন জাগা কি এক জিনিস? তারপর হঠাৎ কী মনে হওয়ায় সে মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে, কৈফিয়তের স্বরে বলে ওঠে, 'কিন্তু ওরা যখন কথা বলত, জামার উপর দিয়ে কারোর কারোর তো স্তনবৃন্ত একদম স্পষ্ট দেখা যেত; তাছাড়া ওদের মুখের আদল আর জামাগুলোর নকশা এত পরিচিত যে, চাইলে আমার আফার কোঁচড় থেকে আমিই বের করে এনে দিতে পারতাম ঐসব! আর, সবচেয়ে যেটা বড় কথা, ওরা কথা বলত আমার থেকে মাত্র দেড় হাত দূরে দাঁড়িয়ে।'

দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে গেছে; দূরে হলুদ পাহাড়ের কোমল হলদে রং। মাথার উপরের কালচে সবুজ আকাশ ধীরে কালো হয়ে যেতে যেতে এখন উজ্জ্বল কালো, লাল কাঁকর বিছানো পথের দু- পাশের মাঠ বহুদূরের উজ্জ্বল দিগন্তে পায়ের কাছে ঘুমুচ্ছে; সেই মাঠটাকে হাতে হাত ধরে ঘিরে আছে ছাই রঙের গাছ- পালা। মাঠের উপরে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবদারু, হিজল, কড়ই— সে বাতাসে কান পাতে। শুনতে পায়, বহুদূর থেকে কার যেন মিহি গলার সুর ভেসে আসছে। সামনের এইসমস্ত দৃশ্য রং মুছে যায় মুহূর্তেই; এবার সে স্পষ্ট শুনতে পায়, মাঝরাত্তিরে শেষ হাঁটুরের দরদ ভরা গলায় গাওয়া গানের আকুল করা সুর— ইশ! এই সুর গেলাসে ভরে মদের মত করে ঢক ঢক করে সে যদি খেতে পারত! সুর ধীরে ধীরে রাত্রির গায়ে মিশে

গেলে ঝিঁঝি পোকার ডাক আর শিশির পড়ার শব্দ স্পষ্ট হয়। সে এবার খুব মনোযোগ দিয়ে শিশির পড়ার শব্দ শোনে; এই শব্দ চিড়ে কার যেন পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়— এতো ছোটনের পায়ের আওয়াজ! চোখের সামনে থেকে যে রঙিন দৃশ্য বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, মুহূর্তেই তা আবার স্পষ্ট হয়।

কাছে এসে ছোটন উদ্বিগ্ন সুরে বলে—
'তুমি ছবির ভিতরে কী কর?'

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চুপ হয়ে যায় সে। তাই তো! তার নিজেরই আঁকা কত শত স্কেচ রয়েছে, আর সে কিনা ঢুকে আছে কার না কার এক ছবির ভেতরে। এই ছবি কে কবে এঁকেছে, কে জানে! তরুণ কত যুগ আগে থেকে অন্ধকারাচ্ছ বাড়িটির দিকে ওভাবে তাকিয়ে আছে, তা-ই বা কীভাবে জানবে সে। ঝুলন্ত কালচে সবুজ আকাশের নিচে এতকাল স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর আজ হঠাৎ করে পাহাড়টি, গাছ-পালা, বাড়ি আর তরুণটি যখন ওর পায়ের আওয়াজে জেগে ওঠেছে, তখন ওদের কীভাবে সে আর বিশ্বাস করবে? এই ছবির ভেতর থেকে বের হওয়াটা এখন খুব জরুরি। কিন্তু ছবি থেকে বের হয়ে গেলে সামনেই এই বাড়ি আর সেখানকার কমলা রঙের ছায়া-মানবীকে আর কোথায় খুঁজে পাবে? এখানে আছে, তবুও তো অন্তত চোখের দেখাটা দেখতে পারছে।

পাশ থেকে ছোটন ওকে অতিক্রম করে, তাগাদা দেয়, 'এইখানে খাড়ায়া থাইকা লাভ কী?' এই প্রশ্নে তার ঘোর কাটে। হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়ায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সে। সেই কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছে অথচ কথাটা একবারও কেন পড়ে নি, এটা ভেবে নিজের ওপরই রাগ হয় তার। সে এতো দুঃখ করছে কেন? বিষন্নই বা হবার কী আছে? যে মানুষ আকাশি রঙের বিশাল বড় ডিমের স্কেচ আঁকতে পারে, ট্রাকের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ওর পায়ের কাছে লুটানো অজস্র নক্ষত্রের স্কেচ আঁকতে পারে— সে চাইলেই তো ঐ অন্ধকারাচ্ছ বাড়িটার স্কেচও আঁকতে পারে! একবার আঁকা হয়ে গেলেই, ঐ বাড়িসুদ্ধ ছায়া-মানবীকে চিরদিনের জন্য বন্দি করে রাখতে পারবে ওর স্কেচে। সে কবেই এঁকে নিত এইসব স্কেচ, কিন্তু সেইসব স্কেচ আঁকতে যে পেন্সিল আর আর্টপেপার দরকার, তা এই পৃথিবীতে কে দেবে ওকে? এজন্য শুধু দরকার একবার এই চামড়ার দেহ থেকে বের হওয়া; বহুকাল আগে মরে গিয়ে ছায়া হয়ে যাওয়া শেকসপিয়ার রবীন্দ্রনাথ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি কিংবা মাইকেল এঞ্জেলোরা নিশ্চয় ওকে সেই পেন্সিল আর আর্টপেপার দিতে পারবে, অবশ্যই পারবে।

সে নিজের দেহের দিকে খুব ধেয়ান ধরে তাকায়। এই দেহই যত নষ্টের গোড়া— ঐ যে হলুদ-ছায়ার তরুণটি হয়ত এখন বসে বসে কমলা-ছায়ার

তরুণীর ঘ্রাণ নিচ্ছে মূখোমুখি বসে, ঐ তরুণের সাথে তার কোনোই পার্থক্য থাকবে না তখন আর; এটা ভেবেও চোখ- মুখ চকচক করে ওর। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, শ্বাস- প্রশ্বাসের গতি ক্রমশ বেড়ে চলছে।

লাল কাঁকর বিছানো পথ ধরে ওরা ছায়ায় ঘেরা বাড়িটার দিকে আগায়। সে একটা বিদ্রুপমাখা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় বাড়িটার দিকে। যতো সামনে আগায়, ছায়া কেটে ততো স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাড়িটার আদল। বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর আগপর্যন্ত, লাল রাস্তার গায়ে ঘষা খেয়ে ওদের পায়ের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে বাতাসে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

ছোটন আশাবাদী গলায় বলে, 'তুমি পারবা! আর, সবে মেরাজ রাইতই এইসব কামের জন্য পারফেক্ট আমি মনে করি।'

— *ছায়া হয়ে যখন যামু, আমার নোটবুকের কী হব?*
— *এতদিন যা লেখছ, যা আঁকছ সব ভুলে গেলে সমস্যা কী?*
— *প্রেমে পইড়া গেছি যে! নোটবুকটা আমার জাদুর বাক্স। আমার পেছনের সমস্ত সময় ঐটাতে বন্দী কইরা রাখছি!*

ঘোর কেটে যায়। নিজেকে হঠাৎ তাদের পরিত্যাক্ত ভাঁড়ার ঘরটাতে আবিষ্কার করে। সেই কবে থেকে এ- ঘরে আসা হয়না, মনে নেই তার। ঘরের এক কোণায় বহুদিন আগের ড্রেসিং টেবিল, সেই টেবিলের লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে— কখন থেকে বা কতক্ষণ ধরে এভাবে আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, ঠিক খেয়াল হচ্ছে না তার। দরজা পুরোপুরি খোলা, ঘরে ২৫ ওয়াটের টিমটিমে আলো, সমস্ত ঘরজুড়ে মশা আর চামচিকার গন্ধ। ভোর হতে আর কত দেরি কে জানে! সে আবার আয়নায় চোখ রাখে— এবার অবাক হয়ে খেয়াল করে, আয়নায় তার নিজের যে ছবিটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে, গত কয়েক বছর যাবৎ দেখে আসা নিজের ছবির সাথে এই ছবির তেমন কোন মিল নেই। বাইরে, রাতজাগা কোনো এক পাখির ডাক কানে আসে। কী মধুর! কী মধুর! এই জীবন, এই পৃথিবী, আর চারপাশের মানুষগুলোর জন্যে মমতায় বুক ভারি হয়ে ওঠে তার। আর অনুভব করে, সে যেন নিজের লোভাতুর আর মিথ্যে স্বপ্নের ফাঁদে আটকে পড়া এক ইঁদুর। যে কিনা, নিজের ভেতরের রক্তমাংসের মানুষটাকে আরেকটু হলে মাটি আর কীট- পতঙ্গের খাদ্যে পরিণত করতে যাচ্ছিল। এই তো সেই, অণু- পরমাণু দিয়ে গঠিত বাস্তব মানুষ। যাকে চাইলেই হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বহুক্ষণ। টের পায়, মিথ্যে স্বপ্নের যে- জগত নিজের ভেতরে এতোদিন বয়ে বেড়াচ্ছিল, তা যেন সশব্দে আছড়ে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলে, চামচিকার দুর্গন্ধময় বাতাস টেনে নেয় বুকের অনেক গভীরে। বাতাসেরও যে স্বাদ আছে, প্রথমবারের মতো টের পায় সে।

তারপর চোখ মেলে তাকায় আয়নার দিকে। নিজের প্রতিবিম্বের চোখে চোখ রাখে। এই প্রথম রক্তমাংসের মানুষটাকে ভারি গুরুত্বপূর্ণ লাগে নিজের কাছে। তখন, মুগ্ধ চোখে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকিয়েই থাকে...

২০১৫

সমাপ্ত

শুনেছি, লেখক বা কবি পরিচিতি নাকি সাধারণত লেখকেরাই লিখে থাকেন। কিন্তু এমনভাবে লিখেন, পড়ে মনে হয় তাঁর সম্পর্কিত ভাল ভাল কথাগুলো বুঝি অন্য কেউ লিখে দিয়েছেন। সবাই যে এমন করেন, তা বলছি না, অনেকেই করেন এমন, শুনেছি। আমার এমন কেউ নাই যে, আমার সম্পর্কে বাছা বাছা ভাল কথা লেখক পরিচিতিতে লিখে দিবেন। তাই আক্ষরিক অর্থেই, আমার পরিচিতি আমাকেই লিখতে হচ্ছে। আমার লেখার জগতে আসা নিয়ে অনেক কথাই ভূমিকাতে বলেছি। লেখা নিয়ে তাই নতুন করে আপাতত কিছু বলার নাই।

আর, আমার সম্পর্কে বলতে গেলে, আমার ডাক নাম রিপন। সতীর্থ আহসান বানানো নাম। ফেসবুকে এসে সাহিত্যিক হবার বাসনায় এই নাম রাখি। এক অর্থে, সব নামই তো বানানো। মায়ের পেট থেকে তো আর কেউ নাম সঙ্গে করে নিয়ে আসে না। লেখাপড়া? অনেক অনেক স্কুলে লেখাপড়া করেছি। তবে মন দিয়ে লেখাপড়া শুরু করি একটা স্থানীয় প্রি- ক্যাডেট স্কুলে। তারপর ২০১০ সাথে স্থানীয় একটা নামকরা স্কুল থেকে এসএসসি পাস করি। তারপর জামালপুরের সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি। তার আগে সিলেট পলিটেকনিক থেকে ডিপ্লোমা। অবশ্য অসমাপ্ত অবস্থায় চলে আসি।

প্রতিদিন ঘুম ভাঙার পর প্রথম যে কথাটা মাথায় আসে, তা হচ্ছে, *আমি কে*? এই যন্ত্রণামূলক অতি অস্তিত্ব- সচেতনতা কুরে কুরে খায়। সত্যি বলতে অনেক পথ পেরিয়ে এখন মনে হয়, এই নিজেকে খোঁজাই আমার লেখালেখির প্রধান উদেশ্য হয়ত। লেখার মধ্য দিয়ে নিজের অজান্তেই নিজেকে খোঁজার প্রয়াস। এযাবৎ যা লিখেছি, মাঝেমাঝে মনে হয়, লেখাগুলো বোধহয় ভালই। আবার মাঝমাঝে উল্টোটা মনে হয়। মনে হয়, অহেতুক পৃষ্ঠা ভরিয়েছি। আমার বোধহয় কোনো সাহিত্য- প্রতিভা নাই।

বিপন্ন বিস্ময় আমার প্রকাশিত প্রথম ইবুক।

সতীর্থ আহসান
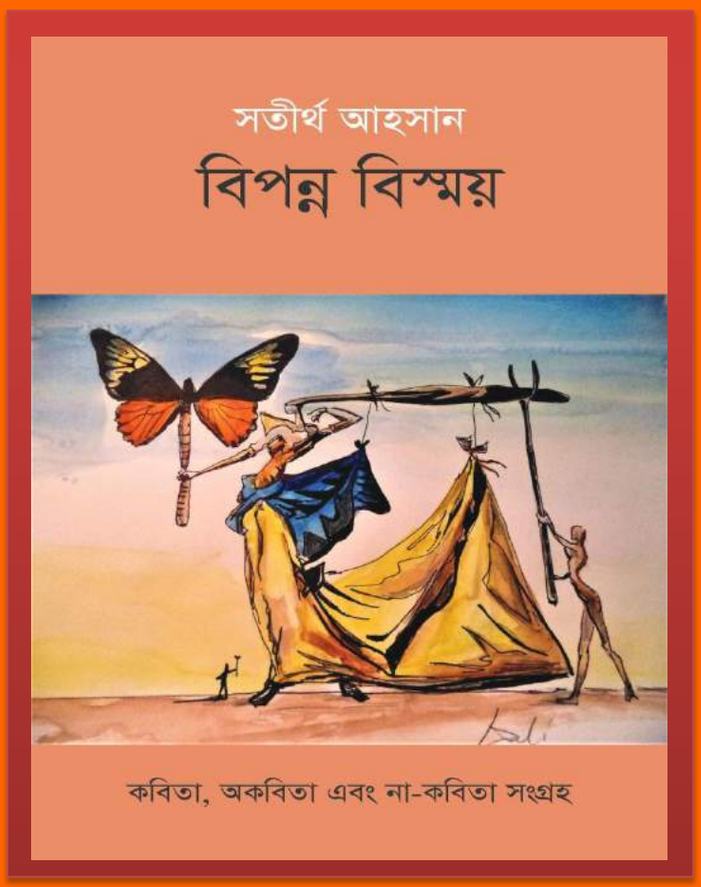
একটি গাঙচিল ইবুক